বাংলাদেশের এনজিও

তৎপরতা বনাম অপতৎপরতা

সম্পাদনায় :
প্রফেসর (ড.) মোহাম্মদ আব্দুর রব

সহ সম্পাদনায় :
প্রকৌশলী মোঃ মোকাররম হোসেন

পিপলস্ সেন্টার ফর রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট

ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইআরডি)

আই আর ডি প্রকাশনা -২

বাংলাদেশের এনজিও
তৎপরতা বনাম অপতৎপরতা

সম্পাদনায়ঃ

প্রফেসর (ড.) মোহাম্মদ আব্দুর রব

সহ-সম্পাদনায়ঃ

প্রকৌশলী মোঃ মোকাররম হোসেন

ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ এ্যান্ড ডেভলপ্‌মেন্ট (আইআরডি)

পিপলস্ সেন্টার ফর রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ এ্যান্ড ডেভলপ্‌মেন্ট (আইআরডি)
পিপলস্ সেন্টার ফর রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট

প্রকাশকাল ঃ ফাল্গুন, ১৪০৯
মার্চ, ২০০৩
মহর্‌রম, ১৪২৪

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ঃ রায়হান জনী

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ কম্পিউটার বিভাগ, আইআরডি

গবেষণা ঃ মোঃ আমজাদ হোসাইন
মোঃ মেহেদী হাসান

বিনিময় ঃ ১৫০ টাকা
$ ৫ ডলার

পরিবেশক ঃ আলীগড় লাইব্রেরী
১৫৮, ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা
ফোনঃ ৮৬১১৩৩০

বাড কম্প্রিন্ট এ্যান্ড পাবলিকেশন
৫০, বাংলাবাজার (৩য় তলা)

প্রিন্টার ঃ জেনিসিস প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং

Bangladesher NGO : Tathporata Bonam Optathporata (NGOs of Bangladesh: Friends o People or Agents of Foreign Countries)

Published By : Institute for Research & Development (IRD)
Dhaka and People Centre for research & development

First Edition : 2003 (March)

Price: Tk. 150.00 (US $ 5.00)

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে এনজিও বা বেসরকারী সাহায্য সংস্থাসমূহের ইতিহাস মাত্র তিন দশকের। এই ক্ষুদ্র পরিসর সময়ে দেশের আর্ত-পীড়িত পশ্চাদপদ দুঃস্থ মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে আগত ও প্রতিষ্ঠিত এসব বেসরকারী সাহায্য সংস্থাগুলোর বেশীর ভাগই তাদের মানব সেবার ছদ্মাবরণে নানা বিদেশী শক্তির নেপথ্য পরিচালনায় এদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী অসংখ্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। তারা বর্তমানে জনগণের কাছে "নব্য-ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী" বা "নব্য কাবুলীওয়ালা", আবার কখনোবা "শোষক-অত্যাচারী" পরিচয়ে অভিসিক্ত হয়েছে। এসব সাহায্য সংস্থা প্রধানতঃ জাতিসংঘের নানা অঙ্গ-সংগঠন তথা বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ-তহবিল (IMF), ফোর্ড ফাউন্ডেশন,এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইউএসএইড, কেয়ার (CARE), অক্সফার্ম ইত্যাদিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতা পেয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিপুল সংখ্যার অত্যন্ত পশ্চাদপদ দরিদ্র জনগণের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারের মূল উদ্দেশ্যকে লুক্কায়িত রেখে জনসেবার নাম করে অসংখ্য এনজিও (NGO) এসব দেশে মানব সেবার কপট বা ছদ্ম অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, কারিতাস, কেয়ার, নিজেরা করি, নারী পক্ষ, এডাব, গণসাহায্য সংস্থা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রভৃতিসহ অসংখ্য দেশী-বিদেশী এনজিও তৎপর রয়েছে। এদের বেশীর ভাগরই আর্থিক ও নৈতিক শক্তির মূল কেন্দ্র দেশের বাইরের বিদেশী শক্তি ও নানা দাতা সংস্থার মধ্যে নিহিত। উপরোন্ত এসব অসংখ্য ক্ষুদ্র এনজিও বাংলাদেশে তাদের মাইক্রো ক্রেডিট (Micro Credit) বা ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের আওতায় বিশাল অর্থলগ্নি তথা সুদী কারবারের জাল বিস্তার করেছে।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের এনজিওগুলো দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্ম-সংস্কৃতি ও চিরায়ত মধুর পরিবারপ্রথা ও সাংস্কৃতিক জীবন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে "পরিবর্তনের অঙ্গিকার নিয়ে পথ চলা" স্লোগান এবং "কিসের ঘর, কিসের বর", "ধর্ম-কর্ম মানব না - পরের ইচ্ছায় চলব না", "ফ্রি সেক্স" ইত্যাদি শিরোনামে তাদের এজেন্ডা ঘোষণা করেছে। আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে পাশ্চাত্য খ্রীষ্টবাদী ও ভিন্‌দেশী ভাবধারা ছড়িয়ে দেয়ার মানসে তারা দেশের পশ্চাদপদ অঞ্চলে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য বিচিত্র ধারার পাঠশালা চালু করে চলেছে। এন্তার টাকা-পয়সা ও নানা সুযোগ-সুবিধার খুদ-কুঁড়া ছিটিয়ে তারা

www.pathagar.com

এদেশের অনেক ভ্রষ্ট নৈতিকতাহীন ভোগবাদী সাহিত্যিক-সাংবাদিক-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী ও সাবেক আমলা-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে তাদের দলে ভিড়াতে সক্ষম হয়েছে। একই সঙ্গে তাদেরকে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেও বিপুল বিক্রমে বিভেদ সৃষ্টি ও বিবাদ-বিসংবাদ বাধানোর জন্যে বিগত জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনসমূহে তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি সমূহের পিছনে আর্থিক ও অন্যান্য বস্তুগত সাহায্য সহযোগীতা নিয়ে কাজ করতে দেখা গেছে।

দেশের এনজিও চক্রের এতই বাড় বেড়েছে যে, তারা এখন দেশে মসজিদ-মাদ্রাসা, আলেম-ওলামা এবং শান্তিপ্রিয় নারী-পুরুষের উপর সংঘবদ্ধ হামলা-আক্রমণও শুরু করেছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন মহল একটু তৎপর হলেই তাদের বিরুদ্ধে এনজিও চক্রের নানা দেশী-বিদেশী সংস্থা "মানবাধিকার লংঘন", "মৌলবাদীদের আক্রমণ", "প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী" ইত্যাদি বলে হৈ চৈ ফেলে দেয়। এক কথায়, এনজিও ও খ্রীষ্টান-মিশনারী সংস্থার বিরুদ্ধে কেউ কোন কিছু বলার সাহস পায়না। তবে আশার কথা হল, দেশের জনগণ এসব এনজিও নামধারী নব্য-ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীকে চিনতে শুরু করেছে। বর্তমানে ক্ষমতাসীন জোট-সরকারের প্রধান দু'টো দল বিএনপি ও জামায়াত ইসলামী উভয়ই তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সব ধরনের এনজিও অপতৎপরতা বন্ধের উদ্যোগও নিয়েছেন। শুধু বাংলাদেশেই নয়, প্রতিবেশী ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্ব স্ব সরকার বহুদিন থেকে এসব এনজিও ও মিশনারী সংস্থার অপতৎপরতার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও বিধি নিষেধ আরোপ করেছে।

পুস্তকখানায় দেশের শীর্ষ গবেষক-লেখক-সাংবাদিক-শিক্ষক-রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবীদের কয়েকটি চিন্তাধর্মী বিশেষণাত্মক নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ***ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমন্ট*** - যা দেশে একটি অন্যতম থিংক ট্যাঙ্ক (Think Tank) ও ডাটা ব্যাংক (Data Bank) হিসেবে কাজ করে চলেছে — এই বইখানা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বইখানা প্রকাশের সাথে যারা জড়িত সকল ব্যক্তি ও সংস্থার জন্যে আইআরডি'র আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ রইল। **"বাংলাদেশের এনজিও তৎপরতা বনাম অপতৎপরতা"** পুস্তকখানা যদি দেশের বিদ্বৎসমাজকে নানা ধরনের অপতৎপরতাকামী এনজিও ও মিশনারী চক্রের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়- তবেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের এনজিও তৎপরতা বনাম অপতৎপরতা

সূচীপত্র ঃ- পৃষ্ঠা নম্বর

১. *প্রফেসর (ড.) মোহাম্মদ আব্দুর রব*
বাংলাদেশে এনজিও ঃ নব্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী উপাখ্যান ৭-১৬

২. *প্রফেসর (ড.) মাহবুব উল্লাহ ও প্রফেসর (ড.) আফতাব আহমাদ*
তথাকথিত সুশীল সমাজের নামে কতিপয় এনজিও রাজনীতি ও রাষ্ট্রের নিয়ন্তা হবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ১৭-৩১

৩. *প্রফেসর (ড.) আফতাব আহমাদ*
এডাবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক ঃ বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই ৩২-৩৮

৪. *প্রফেসর আবু আহমেদ*
এনজিওদেরকে ব্যাংকিং ব্যবসা থেকে বিরত রাখা উচিত ৩৯-৪২

৫. *রণজিত দাস*
এনজিওগুলো কোনদিকে যাচ্ছে ৪৩-৫৩

৬. *প্রফেসর (ড.) মোহাম্মদ আব্দুর রব*
বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে এন.জি.ও. অপতৎপরতা ৫৪-৬৩

৭. *মুহাম্মদ আবু ইউসুফ ও নার্গিস ফারহানা*
বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম ঃ সেবা ও রাজনীতি মূল্যায়ন ৬৪-৮১

৮. *আবদুল আউয়াল ঠাকুর*
বাংলাদেশের তিনশত্রু ঃ ধর্মদ্রোহিতা, আধিপত্যবাদ ও এনজিও ৮২-৮৭

৯. *প্রফেসর (ড.) নজরুল ইসলাম*
বিভাজনের রাজনীতি, ফতোয়া ও এনজিও ৮৮-৯৩

১০. *কবির এন. খান*
এনজিও সম্রাটদের অবাধ অস্বচ্ছতা ৯৪-৯৯

১১. *আবদুল আউয়াল ঠাকুর*
'র' -এর ভূমিকায় এনজিও ১০০-১০৪

১২. *প্রফেসর (ড.) মোহাম্মদ আব্দুর রব*
ফতোয়া ও 'ফতোয়াবাজী': এন.জি.ও. শয়তানীর একটি টার্গেটেড বিষয় ১০৫-১১২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশে এনজিও অপতৎপরতা ঃ নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী উপাখ্যান

প্রফেসর (ড.) মোহাম্মদ আব্দুর রব

মানব সেবার মহান ব্রতের ছদ্মাবরণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের গরীব ও পিছিয়ে পড়া অসংখ্য দেশে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা এনজিও কিংবা খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারক মিশনারীরূপে তুমুল তৎপরতায় তাদের তুলকালাম কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এনজিওগুলোর মধ্যে কতিপয় সংস্থা আসলেই দুঃস্থ মানবতার সেবা, দারিদ্র্য বিদূরণ, শিক্ষার প্রসার ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তাই সমগ্র এনজিও তৎপরতার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই। আমাদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর সতর্কবাণী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও নব্য ঔপনিবেশবাদী আগ্রাসী শক্তিসমূহের অর্থে লালিত এদেশীয় উচ্ছিষ্টভোগী এনজিও এবং সেবা সংস্থা নামধারী অপতৎপরতার বিষয়ে।

এনজিও (N.G.O) বলতে সাধারণতঃ বেসরকারী সংস্থা বা Non Government Organization সমুহকে বুঝায় যারা সমাজের পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য নিজস্ব উদ্যোগে সরকারী সাহায্য ছাড়া কাজ করে থাকে। ঐসব সংস্থা প্রধানতঃ গরীবদের আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি, দরিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, শিক্ষার প্রসার, নিরক্ষরতা বিদূরণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবেশ সচেতনা সৃষ্টি, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা, গণসচেতনতা ইত্যাদি নানা কল্যাণধর্মী প্রকল্প ও উদ্যোগ নিয়ে কাজ করে থাকে। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মাত্র কয়েকটি ছাড়া বেশী অংশ বড় বা বৃহদাকার এনজিওসমূহ এসব জনসেবামূলক প্রকল্পের ছদ্মাবরণে এমনকি প্রায়শঃই প্রকাশ্যে সাম্রাজ্যবাদী দাতা বিদেশী গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষে ধর্মান্তকরণ (খ্রীস্টান মিশনারী তৎপরতা) রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, সামাজিক অস্থিরতা ও বিভক্তি, ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্যিক তৎপরতায় নব্য উপনিবেশবাদী স্থানীয় এজেন্টদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দু'একটি ছাড়া বেশীর ভাগ বড় এবং মাঝারী এনজিওই তাদের ফান্ডের জন্য নানা বিদেশী সংস্থা বিশেষ করে খ্রীস্টান মিশনারী কিংবা পাশ্চত্যের আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের অপ্রকাশ্য আর্থিক উৎসের বিভিন্ন ছদ্ম ও প্রকাশ্য সাইনবোর্ডধারী দাতা গ্রুপ থেকে আর্থিক অনুদান গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া আরো ভয়ংকর এবং উদ্বেগের খবর হল, ইদানিংকালে বর্তমানের এক কেন্দ্রীক বিশ্বব্যবস্থার (Unipolar Global

www.pathagar.com

System) প্রধান নিয়ন্তা মুক্ত অর্থনীতি (Free Economy)'র মূল হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন বিশ্ব ব্যাংক (World Bank), আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (I.M.F) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (A.D.B), ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, এসকাপ এমনকি জাতিসংঘও (U.N.O) যুক্তরাষ্ট্র ও তার পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য মিত্রদের ইচ্ছায় বা নির্দেশে গরীব দেশগুলোর ঐসব মিশনারী সংস্থা বা সাম্রাজ্যবাদের দোসর এজেন্ট এনজিওসমূহকে তাদের সার্বিক মদদ বা সহযোগিতা দিতে শুরু করেছে। কখনো কখনো যদি কোন স্বাধীনচেতা রাষ্ট্রের দেশপ্রেমিক সরকার অথবা জনতা ঐসব রাষ্ট্রবিরোধী দালাল এনজিওদের অপতৎপরতা বা স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে উদ্যোগ নিতে তৎপর হয় তখন বিশ্বসংস্থার মোড়কে সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ঐসব অর্থসংস্থা বা উন্নয়ন সংস্থা মানবাধিকারের লংঘন কিংবা বিপন্ন গণতন্ত্র ইত্যাদির দোহাই দিয়ে দারুণ হৈ চৈ হম্বিতম্বি আরম্ভ করে দেয়। এমনকি, নানা দেশে এসব বিদেশী অর্থপুষ্ট এনজিওগুলো এমনই শক্তিধর ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, তারা তাদের তৎপরতায় কোন রূপ প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে দেশে গণঅসন্তোষ ও রাজনৈতিক সামাজিক হানাহানি দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে সেই সরকারের পতন পর্যন্ত ঘটাতে পিছপা হয় না। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতায় জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক সরকারের পতন ঘটাতে এদেশের বৃহৎ এনজিও ও মিশনারী সংস্থাগুলোর সক্রিয় ভূমিকা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। সরকার বিরোধী তথাকথিত 'জনতার মঞ্চে' বিদেশী অর্থপুষ্ট এনজিওসমূহের নেতৃবৃন্দের উগ্র বক্তব্য প্রদান এবং বিভিন্ন এনজিওসমূহের সরাসরি রাজপথে কর্মী সমাবেশ ও মিছিলে অংশগ্রহণ তাদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রমাণ রাখে। তাছাড়া বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরো যখন কয়েকটি বৃহৎ এনজিও'র আর্থিক হিসাব ও অপতৎপরতার বিষয়ে কিছু জবাব নেবার উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন কয়েকটি প্রভাবশালী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণ সরাসরি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করে এবং মাত্র ৩৬ ঘন্টার মধ্যে এনজিও ব্যুরোর নোটিশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। শুধু তাই নয়, ঐ সময় ঐ সব বিদেশী মদদপ্রাপ্ত শক্তিশালী এনজিওদের জঘন্য অপতৎপরতার বিরুদ্ধে দেশপ্রেমজাত আইনসঙ্গত উদ্যোগ নেয়ার 'অপরাধে' তৎকালিন অত্যন্ত সৎ ও দায়িত্ববান এনজিও ডাইরেক্টর জেনারেলকে তার পদ থেকে তড়িঘড়ি করে বদলির মাধ্যমে শাস্তি বাস্তবায়িত করা হয়। ১৯৯২ সালের ২৮ আগস্ট Dhaka Courier -এ ছাপানো "NGO Defecting the Bureau" শীর্ষক খবরে এর সত্যতা ধরা পড়ে

www.pathagar.com

বিদেশী আগ্রাসী শক্তির মদদপুষ্ট নব্য ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীরূপী এনজিও শক্তি বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্রকামী জনগণের ভোটে রাজনীতিতেও নগ্ন নাক গলানোর ন্যক্কারজনক নষ্টামিতে নেমে পড়েছে। ২০০০ সালের ৯ ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে জেলা প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে উগ্র উস্কানিমূলক এবং অশালীন নারী সমাবেশ ঘটিয়ে বিতর্কিত এনজিও প্রশিকা এবং উক্ত সংস্থাটির ততধিক বিতর্কিত প্রধান এডাব চেয়ারম্যান কাজী ফারুক যে চরম ঐদ্ধত্য ও বেপরোয়া আচরণ করেন এবং এরই ফলশ্রুতিতে শহরটির শান্ত পরিবেশ যে অশান্তি আর অরাজকতার বাঁধ ভেঙ্গে দেন- তা থেকেই এদেশে বর্তমানে এনজিও গোষ্ঠীর পেশীশক্তি ও প্রস্তুতি পরিস্থিতি খানিকটা পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গত ১০-১২-১৯৯৮ পাবনা-২ উপ-নির্বাচনে নিজেদের পছন্দের দল ও প্রার্থীকে জিতিয়ে দিতে এনজিও গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রকাশ্য অপতৎপরতার খবরও এদেশের দলীয় রাজনীতিতে 'মানবতার সেবক' এবং 'সাহায্য সংস্থা' নামধেয় এনজিওগোষ্ঠীর ঔদ্ধত্য ও সীমাহীন চক্রান্তের কিছুটা পরিচয় এবং চিত্রকে জাতির কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা-প্রশাসক, স্থানীয় সাংবাদিক এবং প্রত্যক্ষদর্শী দল মত নির্বিশেষে আপামর স্থানীয় জনসাধারণের বিবৃতি-বক্তব্য এবং একইভাবে পাবনা-২ নির্বাচনী এলাকার সাধারণ মানুষ এবং দেশী-বিদেশী সাংবাদিক প্রত্যক্ষদর্শীর দেখা প্রামাণ্য বিবরণ থেকে দেশের দু'টি চরম অনিয়ম ও ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনার পেছনে বিদেশী অর্থে লালিত এদেশীয় দেশ ও জাতিদ্রোহী অপতৎপরতাকামী এনজিও চক্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং চক্রান্তের হীন চানক্য চাল আর কৌটিল্যের কুটিল কূট-কৌশলের সাক্ষাৎ ও সংযোগ যোগসূত্র পাই। ১৯৯৬'র নির্বাচনের সেই কুখ্যাত তথাকথিত 'জনতার মঞ্চ' নামক চক্রান্তের রঙ্গমঞ্চে এনজিওগোষ্ঠী ও তাদের সম্মিলিত মোর্চা এডাব (ADAB), কাজী ফারুক, এরোমা গুন, খূশী কবির প্রমুখের সক্রিয় তৎপরতায় প্রকাশ্যভাবে দলীয় রাজনীতিতে পক্ষাবলম্বনের ধৃষ্ঠতা দেখাতে সাহস পায়। অবশ্য এরও পূর্বে এরা নানা ছল-ছুতোয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ববিরোধী, জাতি-বিভক্তিকর এবং দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্ম, ঈমান-আকিদা, আদর্শ, বিশ্বাস, কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং ঐক্যবিরোধী বিভিন্ন হীন ষড়যন্ত্রমূলক চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে অসংখ্যবার। ১৯৯০-৯১ সালে মানবাধিকারের নামে বাংলাদেশে জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক জোট "হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টন ঐক্য পরিষদের"-র প্রতিষ্ঠার পেছনে এসব বিদেশী অর্থপুষ্ট এনজিও চক্রের প্রকাশ্য মদদ রয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব বিদেশী মদদপুষ্ট এনজিওদের প্রকাশ্য মদদ ও গোপন চক্রান্তে গঠিত ঘাদানিক গোষ্ঠী ১৯৯৩-৯৪ সালে দেশকে

www.pathagar.com

প্রায় গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। দেশের এক দশমাংশ সার্বভৌমাঞ্চল পার্বত্য-চট্টগ্রামের খুনী 'শান্তি-বাহিনী'র বিচ্ছিন্নতাবাদী ও চরম দেশদ্রোহীতামূলক অপতৎপরতা ও অশান্তির অন্তরালেও এদেশে তৎপর বিদেশী অর্থপুষ্ট নানা এনজিও এবং খৃস্টান-মিশনারী সংস্থার সুস্পষ্ট সংযোগ দেখতে পাই। এসব এনজিও ও খৃস্টান-মিশনারী সংস্থাগুলো দেশের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতা নিরাপত্তায় নিয়োজিত সামরিক বাহিনীর দেশপ্রেমিক সৈন্যদের স্বাভাবিক রুটিন তৎপরতাকে মানবাধিকার লংঘনের দোহাই দিয়ে দেশে বিদেশে দারুণ হৈ চৈ, প্রোপাগান্ডা বাঁধিয়ে দেয়। আবার খুনী বিচ্ছিন্নতাবাদী চাকমা সন্ত্রাসীরা যখন বাংলাদেশের পার্বত্যাঞ্চলের সার্বভৌম এদেশের সীমানার ভিতর বসবাসরত নিরীহ গরীব বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান নারী, শিশু আর বৃদ্ধাদের নির্বিচারে জবাই, হত্যা করে, পবিত্র মসজিদসহ বাঙ্গালিদের গ্রাম, বাড়ী-ঘর নির্বিচারে জ্বালিয়ে দেয়, কাঠুরেদের দলবদ্ধ করে কাতারে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ারে গণহত্যা চালায়- তখন এরা ঐসব মানবতার ধজাধারী এনজিও আর খৃস্টান ধর্মপ্রচারক মিশনারীবৃন্দ তাদের নেতা ফাদার টিম (কারিতাস), কাজী ফারুক (প্রশিকা), ফজলে হোসেন আবেদ (ব্র্যাক), মুহাম্মদ ইউনুস (গ্রামীণ ব্যাংক) কিংবা এরোমা গুন, খুশী কবির, ফ.র.ম. হাসান (গণ সাহায্য সংস্থা) কাউকেই কোন প্রতিবাদ তো দূরের কথা- টু শব্দটিও করতে দেখা যায় না। উপরন্তু, মাঝে মধ্যেই এদের অনেকে নিজ নিজ এনজিও-র লোকজনসহ নানা সমাবেশ, র‍্যালি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আর বিবৃতি-বক্তব্যে নানা উদ্ভট, বানানো আর তাদের প্রভুদের স্বার্থ রক্ষাকারী মন্তব্য উচ্চারণ করতে দেখা যায়- যাতে তারা এদেশের উপজাতীয়, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর দলন, উৎপীড়ন এবং অকল্পনীয় অত্যাচারের বিভৎস্য বিভীষিকাময় কাল্পনিক চিত্র সকরুণভাবে ফুটিয়ে তুলেন পরম পারঙ্গমতা ও অব্যর্থ কৃশলতার মাধ্যমে। আর এভাবেই এসব নেটিভ ক্লাইভ ও কুইসলিংবৃন্দ তাদের এনজিওবাজির মাধ্যমে একদিকে নিজেরা তাদের বিদেশী দাতাসংস্থাসমূহ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি ডলার, পাউন্ড, মার্ক, ইয়েন, রুপি আর ফ্রাঙ্ক; বানিয়ে নিচ্ছে চকচকে নব নব মডেলের বিলাসবহুল পাজেরো, টয়োটা আর নিশান জীপ; অন্যদিকে বিদেশী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি, মান-ইজ্জত আর ইমেজ-আবরুকে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে নিতান্ত নিষ্ঠুর, নির্দয় আর স্বার্থপর জীবের মত স্বদেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বিক সড়াকে গোলামির জিঞ্জিরে অতি অল্পমূল্যে বিকিয়ে দেয়ার গভীর চক্রান্তে রয়েছে রত।

বাংলাদেশের সাহায্য সংস্থা নামধারী বেশিরভাগ এনজিও সুপরিকল্পিত বু-পিন্ট অনুযায়ী গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তাদের বিদেশী দাতা সংস্থা ও

www.pathagar.com

আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহের নির্দেশ-আদেশ ও প্রকল্প-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে। তারা স্থানীয় জনগণের মনোভাব, দুর্বলতা, রাজনৈতিক ঝোঁক প্রবণতা ইত্যাদি অবহিত হওয়ার জন্য নানা ছদ্ম গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করে। এদের এসব জরিপ ও গবেষণার পেছনেই কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। বেশিরভাগ অপতৎপরতাধর্মী এনজিও-র মূল টার্গেট স্থানীয় জনসাধারণের ধর্ম ও ঐতিহ্যগত জীবনাচরণ। নতুন প্রজন্মকে ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে দূরে সরানো, পরিবার প্রথা ভেঙ্গে ফেলা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন, পর্দা প্রথা, বিবাহ-তালাক, ফতোয়া-শরিয়ত, মসজিদ-মাদ্রাসা ইত্যাদি) দুর্বল ও নড়বড়ে করে দেয় এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব-আলেম-ওলামা, পীর-বুজুর্গ, দ্বীনি-রাজনীতি ইত্যাদির প্রভাব গুরুত্ব ধ্বংস করে দেয়াই এনজিও চক্রের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। আর এসব সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা গ্রহণ করেছে বিভিন্ন "শর্ট-টার্ম" এবং "লং-টার্ম," পরিকল্পনা স্থাপন করেছে নানা ছদ্ম গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, গণ-সচেতনা উদ্বুদ্ধকর কেন্দ্র; প্রকাশ করছে ডজনে ডজন দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিক রং-বেরঙের ম্যাগাজিন জার্নাল এবং বিপুলভাবে অনুপ্রবেশ করছে সকল সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও প্রচার-মাধ্যমের অভ্যন্তরে। একই সঙ্গে তারা মোটা অংকের বেতন উৎকোচ ঘুষের বিনিময়ে হাত করে নিচ্ছে দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী সাবেক ও বর্তমান আমলা, সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা; রাজনৈতিক নেতা, ছাত্রনেতা, গ্রাম্য মাতব্বর এবং আদর্শহীন সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবীদের। প্রয়োজনের সময় খুব দ্রুত এনজিওসমূহ এসব আত্মবিক্রীত আমলা, বুদ্ধিজীবীদের থেকে নিজেদের স্বার্থের ও চক্রান্তের পক্ষে বক্তব্য বিবৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়।

জনসেবার নামে তৎপর এসব বিদেশী অর্থপুষ্ট এনজিওদের ঘৃণ্য মুখোশ এখন আরও নগ্নভাবে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর আরও নানা দেশে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। ভারতের কংগ্রেস আমলেই অত্যন্ত কঠোরভাবে এনজিও ও খ্রীস্টান মিশনারীদের কপট ছদ্ম তৎপরতার উপর বিশেষ করে অর্থের বিনিময়ে ও মানব সেবার (চিকিৎসা) মাধ্যমে ধর্মান্তকরণ এর উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এবং স্থানীয় রাজনীতিতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ছদ্মাবরণে অনধিকার চর্চাকে বা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপকে বন্ধ করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের মাদ্রাজের (বর্তমান চেন্নাই) অত্যন্ত প্রভাবশালী কলেজ শিক্ষক প্রিন্সিপাল ফাদার জনকে এমনি অনভিপ্রেত এনজিওবাদী বা মিশনারী তৎপরতার অভিযোগে মাত্র ৪৮ ঘন্টার নোটিশে ভারত থেকে বহিষ্কার করা হয়। অবশ্য তার বিরুদ্ধে বিদেশী

www.pathagar.com

চক্রের পক্ষে গোয়েন্দা বৃত্তি ও ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টির অভিযোগ দেখান হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এমনি আর এক অধ্যক্ষ ফাদারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ধর্মীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির অপতৎপরতার রিপোর্ট ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বিদেশী শক্তি হুমকিতে এ দেশের সরকার সম্পূর্ণ অসহায়ের ভূমিকায় রয়েছে। শুধু ভারতেই নয়, স্থানীয় রাজনীতিতে অবৈধ নাক গলানোর অভিযোগে মালয়েশিয়ার মত দেশেও বহু এনজিও ও খ্রীস্টান মিশনারী সংস্থার কর্মকান্ডে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং আমাদের প্রতিবেশী মায়ানমার থেকে নানা এনজিও এবং মিশনারী সংস্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। কারণ, ঐসব স্বাধীন চেতা জাতি দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও অখন্ডতাকে এনজিও কিংবা ধর্মপ্রচারের ছদ্ম মিশনারীদের সামান্য আর্থিক সাহায্যের মূল্য থেকে অনেক বেশী দামী বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। কিছুটা বিলম্বে হলেও বাংলাদেশের জাগ্রত জনতাও সাম্রাজ্যবাদী উচ্ছিষ্টভোগী এনজিওদের অপতৎপরতার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ও প্রতিবাদী হয়েছে। জনগণ এখন বিদেশী অর্থপুষ্ট এনজিওগুলোর বিলাসী কর্মকর্তাদের বিশাল দামী শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পাজেরো গাড়ীগুলোর দিকে সন্দেহ ও ভীতির চোখে তাকাচ্ছে। বেসরকারী সংস্থাগুলো বর্তমানে রাখটাক না করেই তাদের নগ্ন পুঁজিবাদী ব্যাংকিং অর্থ লগ্নির কারবার, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, ট্রেডিং, প্রকাশনা ও লোকশিল্প ভিত্তিক নানা কিসিমের কায়কারবার শুরু করে দিয়েছে। ব্র্যাকের আড়ং, ডেইরী ফার্ম সারাদেশের বিরাট বাণিজ্যিক চক্র ফেঁদে বসেছে। গ্রামীণ ব্যাংক তো ইতোমধ্যেই তাঁতশিল্প, টেলিফোন শিল্প, ব্যাংক বীমা ইত্যাদি হরেক রকমের ব্যবসা বাণিজ্য ছড়িয়ে দিয়েছে সারা দেশব্যাপী। গণসাহায্য সংস্থা (G.S.S) দেশের হাজার হাজার একর জমি (খাস ও বেসরকারী) খরিদ কিংবা বন্দোবস্ত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ রকম আরও অনেক সংস্থা বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্য, পুঁজি প্রাসাদোপম অট্টালিকা, দালান নির্মাণ করে যেন আত্মসেবাতেই বেশী মনোনিবেশ। এরা অবশ্য প্রতিবছর তাদের মানব সেবার চিত্র প্রচারের অসংখ্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং বেতার টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকায় অজস্র নিবন্ধ, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন এবং ব্যানার, পোস্টার ইত্যাদির প্রকাশনা, সম্পাদনা ও আয়োজন করে থাকে- বিদেশী মদদপুষ্ট এনজিওসমূহ তাদের বৈষয়িক স্বার্থকে সংরক্ষিত ও নিরাপদ রাখতে। সংস্থায় অবসরপ্রাপ্ত ক্ষমতাধর আমলা-ব্যুরোক্রেটদের চাকরি দিয়ে থাকে এবং বর্তমানে ক্ষমতাসীন আমলা, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ভোগবাদী সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে।

www.pathagar.com

এনজিওসমূহ এবং তাদের সৃষ্ট বিভিন্ন 'মানবাধিকার সংস্থা' কিংবা নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা (যেমন- FEMA) সমূহ তাদের অত্যন্ত প্রশিক্ষিত জনশক্তি ও পরিকল্পিত এবং কার্যকর প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের সমর্থিত বা পক্ষের প্রার্থীদের নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিষয়ে তাদের স্বার্থ ও পছন্দমাফিক ফলাফল, প্রক্রিয়া 'সুষ্ঠু' বা 'ত্রুটিপূর্ণ' বলে সফল প্রচার-প্রোপাগান্ডা চালায়। বলাই বাহুল্য, এসব নির্বাচন মনিটরিং সংস্থাসমূহের বেশী অংশই পাশ্চাত্যের বিদেশী দাতাগোষ্ঠীর অর্থে পরিচালিত এবং এনজিও সিভিল-সোসাইটি এবং মিশনারী চক্রের মদদ ও পরিকল্পনায় পরিচালিত হয়ে থাকে। সব সময়ই এসব চিহ্নিত "Election Monitoring Organization" বা "নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা" ইসলামী কিংবা দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং ধূরন্ধর প্রক্রিয়ায় তৎপরতা চালায় এবং অভিমত প্রকাশ করে। আসলে, এদের কাজই হল দেশপ্রেমিক শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুতিকরণ প্রক্রিয়ায় আধিপত্যবাদী শক্তির মুখপাত্র হিসেবে গোয়েবলস-এর ভূমিকা পালন। এক্ষেত্রে দেশের ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রচারণা দুর্বল হওয়া বা প্রায় না থাকাতে FEMA-র মত এনজিও সব সময়ই খালি ময়দানে সম্পূর্ণ একচ্ছত্র কুশলতায় গোল দিয়ে যাচ্ছে।

দেশের রাজনীতিতে এনজিও চক্রের নগ্ন হস্তক্ষেপের কারণে ১৯৯৮ সালে পাবনা-২ এলাকার উপনির্বাচনে বিএনপি'র প্রার্থী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। গত ১২-১২-৯৮ তারিখে 'দৈনিক আজকের কাগজ' -এর ১ম পৃষ্ঠার "পাবনা উপ-নির্বাচনঃ আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র জয়-পরাজয়ের নেপথ্যে" শীর্ষক খবর থেকে জানা যায় যে, ঐ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী বিএনপির প্রার্থীকে পরাজিত করার জন্য খৃস্টান মিশনারি এনজিও 'চ্যারিটি ফর ডেভেল্পমেন্ট অব বাংলাদেশ' এবং সমতা সমাজ কল্যাণ সমিতি' বিপুলভাবে কাজ করে গেছে। তাছাড়া ঐ এলাকার জনগণ থেকে জানা যায়, ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা এবং গণ-সাহায্য সংস্থার বিপুল কর্মীবাহিনী বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজ করে গেছে। জামায়াতের প্রকাশ্য সমর্থন দেয়া এবং জাপার প্রার্থী উইথড্র করে নেয়ার পরও ২০,০০০ ভোটের ব্যবধানে বিএনপির পরাজয়ের পেছনে পাবনা উপনির্বাচনে চক্রান্তকারী এনজিও চক্রের অপতৎপরতাকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। ১২ ডিসেম্বর (১৯৯৮) তারিখের 'আজকের কাগজ'-এর ভাষায়, "..... বিএনপির জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় বেড়া ও সুজানগর থানায় কর্মরত কয়েকটি এনজিও। বিশেষ করে সিসিডিবি এবং সমতা সমাজ কল্যাণ সমিতি নামের এনজিওদ্বয় সরাসরি ও প্রকাশ্যে বিএনপির বিপক্ষে অবস্থান নেয়। C.C.D.B. নামের খৃস্টান মিশনারী এনজিও সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০০০ এবং সমতা সংস্থার

www.pathagar.com

সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৩,০০০। ঐ এনজিওদ্বয়ের পক্ষ থেকে এমনও বলা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ প্রার্থী এ কে খন্দকারকে ভোট না দিলে সকল সাহায্য দেয়া বন্ধ করা হবে (৬ এবং ৭ কলাম)"। শুধু পাবনা-২ উপনির্বাচনেই নয়- অপতৎপরতাকামী এনজিও চক্র সাম্প্রতিককালের প্রায় সকল নির্বাচনেই তাদের লোকবল, পরিবহণ সুবিধা, টাকা-পয়সা, প্রচারযন্ত্র বিএনপি, জামায়াত ও জাপার বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে আসছে এবং তাদের মনোভাব দেখে মনে হয় ভবিষ্যতেও এনজিও চক্র আরো পরিকল্পিতভাবে, অতিকুশলতায় এবং প্রকাশ্যে তাদের এ হীন রাজনৈতিক অভিযাত্রা জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

দুষ্ট এনজিওগুলোর সবচেয়ে ভয় দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তি, আধ্যাত্মবাদী গোষ্ঠী, দেশপ্রেমিক সামরিক শক্তি বা সেনাবাহিনী ও স্বাধীন মুক্ত চিন্তার দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীদের। এসব দেশপ্রেমিক শক্তিকেই ঐসব এনজিও ও মিশনারী নামধারীরা বড় দুশমন মনে করে এবং এদেরকে করতে চায় দুর্বল ও ধ্বংস। তাই তারা দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে তাদের সহযোগী পেশীশক্তিকে সব সময় ক্ষমতাসীন করতে সচেষ্ট হয়। দেশের শক্তিশালী ধর্মীয় আদর্শবাদী দলকে ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী ও বিদেশী অর্থপুষ্ট মিডিয়া (টিভি বা সংবাদ মাধ্যমে) অনবরত মৌলবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, ফতোয়াবাজ ইত্যাদি অপবাদ দেয়ার অপপ্রয়াস চালায়। এসব সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরূপী এনজিও ও মিশনারী চক্র সবচেয়ে জঘন্য যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে- তারা তাদের মিডিয়া ও ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে অপপ্রচার করে দেশের অতন্দ্র প্রহরী ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে তৎপর জাতীয় সেনাবাহিনীর চরিত্র হনন করে তাদেরকে ধিকৃত, বিকৃত ও গণবিচ্ছিন্ন পরনির্ভরশীল হিসেবে জনগণের কাছে তুলে ধরার অপতৎপতরতা চালায়। এর একটি হিসেবে নব্য উপনিবেশবাদের এজেন্ট এনজিও এবং মিশনারী চক্র ইদানিং "সিভিল সোসাইটি" (Civil Socity) আন্দোলন শুরু করেছে। এই তথাকথিত সুশীল বা সিভিল সোসাইটি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যেই হল জাতীয় সমাজকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলা, প্রশাসন ও সামরিক ব্যবস্থাকে নড়বড়ে ও দুর্বল করে দেওয়া এবং মিলিটারী বিভাজন সৃষ্টি করে সামাজিক নৈরাজ্য ও গৃহযুদ্ধের সূচনা করা। নৈরাজ্যের ফোঁকড় গলে স্থানীয় অস্থিরতা ও গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগে 'মান রক্ষা'র কথা বলে জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় এক সময় তাদের প্রভু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিভুকে আগ্রাসনের সুযোগ করে দেয়া। N.G.O'রা বাংলাদেশে এখন এ পথে এগোচ্ছে।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট অপতৎপরতাবাদী এনজিও ও মিশনারী সংস্থাসমূহ তাদের বিদেশী প্রভূদের নির্দেশে বাংলাদেশের মত ইসলামী দেশগুলোর ধর্মীয় বিশ্বাস, পারিবারিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক চেতনা ইত্যাদি স্বকীয় ধ্যান ধারণা ধ্বংস করতে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। কারণ, জাতীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক চেতনাই তাদের স্বাধীন থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়। আর এ অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তারা নবীন প্রজন্মের মনে নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় গ্রন্থ এবং ধর্মীয় নেতা আলেম ওলামা-মাশায়েখ এবং ধর্মীয় রাজনৈতিক বা সামাজিক শক্তি সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা এবং বিরূপ মনোভাব তৈরীর প্রচেষ্টা চালায়। এক্ষেত্রে এনজিও ও মিশনারী সংস্থাগুলো নাটক, চলচ্চিত্র, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, সাহিত্য, ফিচার, প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, টিভি, ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে থাকে। দেদার অর্থের বিনিময়ে তারা অসৎ, ভোগবাদী দেশদ্রোহী লেখক, কবি, সাংবাদিক ও নাট্যকারদের ব্যবহার করতে থাকে। এসব এনজিও ও মিশনারী সংস্থাসমূহের এমনি একটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত আক্রমণ কিছুদিন আগে দেশদ্রোহী মুরতাদ মহিলা কবি তস. নাসরিনের কিংবা দা. হায়দারের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ধর্মদ্রোহীমূলক আচরণের পেছনেও বিদেশী অর্থপুষ্ট এনজিওসমূহের মদদ রয়ছে বলে জানা যায়। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, বৃটিশ ভারতীয় নাস্তিক তসলিমা নাসরিন কিংবা দ. হায়দার এদের প্রত্যেকের পক্ষ সমর্থন করে নানা N.G.O বিবৃতি দিয়েছে এবং এদের সবাইকেই যুক্তরাজ্য, জার্মানী কিংবা ফ্রান্স ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়েছে প্রকাশ্যে।

এদেশে সক্রিয় এনজিও চক্র ইসলাম ও আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে যে কি ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালাচ্ছে- তা তাদের সাম্প্রতিককালে পরিচালিত "অপারেশন ফতোয়াবাজ"-এর নানা তৎপরতা থেকে দেখা যায়। নিরন্তর তারা তাদের অর্থে এবং আনুকূল্যে প্রকাশিত সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে অসংখ্য ইসলামবিদ্বেষী "ফতোয়াবাজবিরোধী" ক্রোড়পত্র, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, মন্তব্য এবং বানানো মিথ্যা কিংবা পাকানো সংবাদ প্রকাশিত করে চলেছে। গত ১১ ডিসেম্বর (১৯৯৮) এনজিও দৈনিক ভোরের কাগজের ১ম পৃষ্ঠার খবর থেকে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সংঘটিত ৭-১২-৯৮ তারিখে দুঃখজনক ঘটনার জন্যও এনজিও চক্র বিশেষ করে প্রশিকা, এডাব, তৃণমূল সংস্থা ইত্যাদি ইসলামবিদ্বেষী সংস্থাই দায়ী। ঐ খবরে বলা হয়, ব্রাহ্মবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক এ কে এম ওয়াহেদুল ইসলাম সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার সময় বলেন, হিংসাত্মক ঘটনাটির জন্য এডাবের চেয়ারম্যান এবং প্রশিকার পরিচালক কাজী ফারুক আহমদের জেদ ও বাড়াবাড়িই দায়ী। বিভিন্ন সংবাদ থেকে জানা যায়, এনজিও চক্র হিংসাত্মক

www.pathagar.com

মিছিল থেকে আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে নানা ইসলামবিরোধী উস্কানিমূলক শে-াগান ধ্বনি দেয় এবং এক পর্যায়ে তারা অস্ত্র থেকে গুলীও ছোঁড়ে। ১২-১২-৯৮ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকের খবর থেকেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৭ ডিসেম্বরের (১৯৯৮) ঘটনার জন্য এনজিও চক্রের উস্কানি ও ষড়যন্ত্রকে দায়ী করা যায়। ইত্তেফাকের খবর থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমান্ডার গাজী মোঃ রতন মিয়া সুস্পষ্টভাবে অভিযোগ করেন যে, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাম ভাঙ্গিয়ে এনজিও চক্র ও এডাব নেতা কাজী ফারুক নিতান্ত চক্রান্তমুলক কর্ম সংঘটন করেছেন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সুণাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। সংবাদপত্রসমূহের খবর থেকে জানা যায়, এরোমা গুন নামের এক অমুসলিম এবং ভিন্নধর্মাবলম্বী এনজিও নেত্রী ওলামা ও ইসলামী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অত্যন্ত অশালীন ধৃষ্ঠতাপূর্ণ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এনজিও সমাবেশে। তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম-ওলামাদের ফতোয়াবাজ বলে কটুক্তি করেন এবং সমাবেশে অংশগ্রহণকারী বহু এনজিও নেতৃবর্গ দ্বীনি শিক্ষালয় মাদ্রাসা বন্ধ করার মত ধৃষ্ঠতাপূর্ণ দাবী উত্থাপন করেন। শ্রীমতি এরোমা গুণের মত একজন শিক্ষিতা অমুসলিম ভিন্নধর্মী এনজিও নেত্রী কিভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার মত হীন উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখার সাহস পায়- তা থেকেও এনজিও চক্র নারীমুক্তি ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাকামী বক্তব্যের আড়ালে অত্যন্ত সূচতুরতার সাথে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় বিধান ও মধুর পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে ফেলার অপপ্রচেষ্টার চক্রান্ত আন্দাজ করা যায়। সমাজে সংঘটিত যে কোন অনিয়ম, অপরাধ কিংবা অন্যায়কে এনজিও এবং তাদের সহযোগী চক্র ধূর্ত ও ধুরন্ধর কূটকৌশলে ইসলামের এবং আলেম সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালায়। আর তাদের এসব চক্রান্ত ধরা পড়ে গেলে কিংবা তাদের ইসলামবিরোধী অপতৎপরতায় ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করলে এনজিও চক্র 'মানবাধিকার গেল', 'মানবাধিকার বিপন্ন' 'মৌলবাদী হামলা', 'সাম্প্রদায়িক তৎপরতা' ইত্যাদি বলে দারুণ হৈ চৈ, হট্টগোল বাধিয়ে দেয়। আধিপত্যবাদী বিদেশী প্রভুদের উচ্ছিষ্টভোগী বাংলাদেশের এনজিওরূপী এসব নব্য ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী চক্রকে এখনই প্রতিরোধ করতে হবে। বিলম্বে, জাতিকে আবার আরেক পলাশীর পালা পোহাতে হবে। আলাহ দেশ ও জাতিকে হেফাজত করুন।

লেখক ঃ অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

তথাকথিত সুশীল সমাজের নামে কতিপয় এনজিও রাজনীতি ও রাষ্ট্রের নিয়ন্তা হবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত

প্রফেসর (ড.) মাহবুব উল্লাহ
প্রফেসর (ড.) আফতাব আহমাদ

ড. মাহবুব উল্লাহ

'৯১ সালের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার সাথে সাথে একটি প্রত্যয় বা একটি প্রপঞ্চ রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবীমহলে আলোচিত হচ্ছে। বিষয়টি হচ্ছে সিভিল সোসাইটি এবং প্রায় সব রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী বলে থাকে যে, সিভিল সোসাইটিকে শক্তিশালী করাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য। কিন্তু এই সিভিল সোসাইট কি ? এর প্রকৃতি, পরিচয় বা অভিব্যক্তি কি ? সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা আমরা লক্ষ্য করি না। অনেকেই মনে করেন যে, অসামরিক যে কোন কিছুই হচ্ছে সিভিল সোসাইটির অন্তর্গত। আর সামরিক যা কিছু, তা হচ্ছে সিভিল সোসাইটির শত্রুপক্ষ। আমি কিছুদিন আগে পল স্ট্রিটনের Paul Streeten-এর Rethinking Development বইটি পড়ছিলাম। এই বইটিতে Paul Streeten-এর মত একজন বিখ্যাত উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ, যিনি ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট জার্নাল এডিট করেন, তিনি তাঁর সেই বইয়ে- আসলে ইতালীতে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারই মুদ্রিত রূপ হচ্ছে এ বই-বিশাল গ্রন্থ। সেটি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশ করেছে। সেখানে তিনি বলেছেন যে, গণতন্ত্রের জন্য, উন্নয়নের জন্য সিভিল সোসাইটি অপরিহার্য। আর এ কথা বলতে গিয়ে তিনি নির্দেশ করেছেন যে, সিভিল সোসাইটি হচ্ছে এনজিও। অর্থাৎ এনজিওগুলোই সিভিল সোসাইটি। যে কারণে আজকাল কেউ কেউ মনে করেন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে একদিকে কাজ করে রাষ্ট্র, অন্যদিকে প্রাইভেট সেক্টর। আর থার্ড সেক্টর অব ডেভেলপমেন্ট হিসেবে কাজ করে এনজিওগুলো। আমার একান্ত মত হচ্ছে যে, Paul Streeten-এর মত মানুষের কাছ থেকে এ ধরনের একটি অন্তঃসারশূন্য সিভিল সোসাইটির তথ্যটা অত্যন্ত গভীর এবং এটা বুঝতে গেলে নানা প্রসঙ্গ আমাদের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে। আজকে আসার পথে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, একটি পকেটমারকে উন্মত্ত জনতা ঘিরে ধরেছে, মারধর করছে এবং লোকটির প্রাণবায়ু প্রায় বেরিয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। তার কাপড়চোপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, প্রায় দিগম্বর অবস্থা। হয়তো সে সেখানে মারাও যেতে পারে। একটি সিভিল সোসাইটিতে এ ধরনের ঘটনা আশা করা যায় না। একটি সিভিল

www.pathagar.com

সোসাইটিতে কেউ অপরাধ করলে তাকে বিচারে সোপর্দ করা হয়। পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়। তারপরে সে সত্যি সত্যি অপরাধী কিনা সেটা নির্ণয় করা যায় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ সিভিল সোসাইটির কনসেপ্টটার সাথে সিভিলিটির, পলিশ নস-এর একটা গভীর যোগাযোগ আছে। কিন্তু এই পলিশ, নস সিভিলিটি, সিভিলাইজেশন বা সফিসটিকেশন-এই জিনিসগুলো কিন্তু absolute নয়, এগুলো সময়, কাল এবং সমাজব্যবস্থার সাথে আপেক্ষিক। যেমন- মার্কিন সমাজের মত সমাজ। সেখানে আমরা বলি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সহনশীলতা অত্যন্ত উচ্চমাত্রায় পৌঁছেছে, সেই সমাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে হার্বার্ট মার্কিউজ বলছেন যে, সেখানে এক ধরনের রিপ্রেশন থ্রু টলারেন্স চলছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি' অর্থাৎ সভ্যতার যতটুকু অগ্রগতি হয়, তার মধ্য দিয়ে মানুষের নিপীড়ন বা সামাজিক বঞ্চনার কৌশলগুলো পাল্টে যায় এবং এগুলোরও এক ধরনের সফিসটিকেশন অর্জিত হয়। সুতরাং সভ্যতা এগুলোই সিভিল সোসাইটি এগুচ্ছে- এটা, বলা কতটা যৌক্তিকম সে সম্পর্কে সন্দহ আছে। তাছাড়া, দার্শনিকদের মধ্যে এ নিয়ে যে তর্ক, তাতে তারা কেউ কেউ বলছেন, সিভিল সোসাইটি অত্যন্ত জরুরী। আবার কেউ কেউ বলছেন, সিভিল সোসাইটি কথাটি অর্থহীন। যেমন- আমরা যদি আইডিয়া অব সিভিল সোসাইটির দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে, আমরা যে সমাজে বাস করি, সেখানে কীভাবে আমরা এই সমাজের যে এক ধরনের এক্সটারনাল অথরিটি থাকে, তার পাশাপাশি এ ধরনের যে প্রাইভেট ইন্টারেস্ট থাকে, এ দুয়ের মধ্যে যে একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম সম্পর্ক থাকে বা যে ডেলিকেট রিলেশনশীপ আছে, সেটা আমাদের বুঝতে হবে এবং সিভিল সোসাইটি আমাদের এগুলো বুঝতে সাহায্য করে। আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, কীভাবে সমাজের রহস্যময় এবং অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়াগুলো কাজ করে। সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, লিখেছেন, সেগুলোর হয়তো একটা সাহিত্যমূল্য থাকতে পারে, কিন্তু তার বিশ্লেষণীমূল্য খুবই কম। আমরা সিভিল সোসাইটির সংজ্ঞা নিয়ে নানান বিতর্ক করে থাকি কিন্তু তার পাশাপাশি প্রশ্ন করি না যে, সেই সিভিল সোসাইটিটাকে গ্রহণ করার পরিণতিটা কি ? এই অর্থে সিভিল সোসাইটির তর্কটা অনেকটা অন্তঃসারশূণ্য এবং বিরক্তিকর হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে আমি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করি, যেখানে আমাদের কিছু বিখ্যাত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে দুঃজন ছিলেন, যারা সামরিক সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং এদের মধ্যে একজন, যিনি বিশ্বাস করেন যে,

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী থাকা উচিত নয়। এছাড়া আরো একজন পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে একেবারে বাংলাদেশের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে বিরাট আকারে সহযোগিতার কথা এডভোকেট করেন এবং সেখানে এদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিল এই বলে - In this gathering the best representatives of our civil society is present. সেখানে দু'চারটা বিখ্যাত এনজিও'র উপরস্তরের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এই হচ্ছে আমাদের দেশের সিভিল সোসাইট সম্পর্কে উপলব্ধি। আমি মনে করি, এটি কোন খন্ডিত উপলব্ধিই নয়, এটি অত্যন্ত ভ্রমাত্মক ও বিপজ্জনক উপলব্ধি। এভাবে যদি সিভিল সোসাইটির মূল্যায়ন হয়, তাহলে খুব ভুল করা হবে। আমাদের দেশে সিভিল সোসাইটির best বা reknowned representatives বলতে যাদের আমরা বুঝি, তারা সময় বুঝে নীতির কথা বলেন- আবার সময় বুঝে নীতিবিচ্যুত হয়ে নীরব থাকাটা পছন্দ করেন। এমনকি নীতি বিবর্জিত, গণতান্ত্রিক চিন্তচেতনার বিরোধী ধ্যান-ধারণাকে তারা পোষণ করেন। সুতরাং সেই অর্থে আমাদের দেশে সত্যিকারের সিভিল সোসাইটি গড়ে উঠেছে কি না, সেরকম একটা প্রশ্ন জাগতে পারে। আমাদের দেশে যেসব বিদেশী সাহায্য দাতারা আসে, তারাও একেবারে ব্ল্যাঙ্কেট টার্মে, সাদামাটাভাবে এনজিওদেরকে সিভিল সোসাইটি মনে করে। আমি যে ব্যক্তিবর্গের কথা বলছিলাম, সেই ধরনের ব্যক্তিবর্গকেই সিভিল সোসাইটি হিসেবে তারা গ্রহণ করে। পত্রিকায় যারা কলাম লেখেন, বিভিন্ন ধরনের গোলটেবিল বৈঠকে যারা আলোচনার ঝড় তোলেন- এ জাতীয় লোকদেরকেই তারা সিভিল সোসাইটি হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু এদের মধ্যে সিভিলিটির, মূল্যবোধের কনসিসটেন্সি কতটা আছে, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সিভিল সোসাইটি যদি বুঝতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে, সমাজটাকে আমরা কতটা 'সমাজ' হিসেবে সম্ভব করে তুলতে সক্ষম হয়েছি। এই সমাজকে 'সমাজ' হিসেবে সম্ভব করার যে প্রয়াস, সেটাই সম্ভবত সিভিল সোসাইটি সৃষ্টির প্রয়াস। তো আমাদের সমাজে সিভিল সোসাইটির একটা কদর্থ করছি, এটা একটা আলোচনা হওয়া দরকার। এবং এই সংক্রান্ত যে মিথ্যাগুলো, যে ভুল ধারণাগুলো রয়েছে, সেগুলো একটু এক্সপোজ করা দরকার।

ড. আফতাব আহমাদ

আসলে নব্বইয়ের দশককে বলা হয়, গণতন্ত্রের জোয়ারের দশক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট পন্ডিত ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন একে অভিহিত করে বলছেন The Third Wave হিসেবে। লক্ষ্য করার বিষয় হলে যে, নব্বইয়ের দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বহুলভাবে আলোচিত যে কনসেপ্ট সেটি হচ্ছে

www.pathagar.com

সিভিল সোসাইটর কনসেপ্ট। ভাবখানা এমন যে, সিভিল সোসাইটি নামক কোন বস্তুর অস্তিত্ব ইতোপূর্বে ছিল না। হঠাৎ করে এই সিভিল সোসাইটি বিনির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সিভিল সোসাইটির যথোচিত বাংলা পরিভাষা হলো 'জনসমাজ'। 'জনসমাজ' বলতে আমরা কী বুঝি সে সম্পর্কে যদি আমরা গোড়াতেই ধারণা নিতে পারি, তাহলে আমাদের আর কোন বিভ্রান্তি থাকবে না। আমাদের সমাজে অধুনা বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির আনাগোনা আমরা লক্ষ্য করছি, যারা পালাক্রমে কখনও বলেন 'সিভিল সোসাইটি' কখনও বলেন 'সুশীল সমাজ'। ভাবটা এই যে, একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে কিছু লোক সুশীল এবং কিছু লোক দুঃশীল; শিশ্চাচারবর্জিত, বর্বর। এই ধারণাটি একটি অত্যন্ত স্থূল, অবৈজ্ঞানিক এবং বাস্তবতাবিবর্জিত ধারণা। সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে কথা বলতে গেলে অনেক পেছনে চলে যেতে হয়। প্রাচীন যুগের রোমান রাষ্ট্রনায়ক ও দার্শনিক Marcus Tullius Cicero- কে নিয়ে তাহলে এ প্রসঙ্গে একটি আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারে। Cicero দৃঢ় এবং গভীরভাবে Moderation, concord ও Constitutionalism-এ বিশ্বাস করতেন। এ ধারনা বিশ্বাস কেবলমাত্র সামাজিক স্থিতিশীলতার মধ্যেই অব্যাহত থাকতে পারে। সমাজে অসহনীয় চিড় ও ফাটল সামাজিক স্থিতিশীলতাকে যখন মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে তোলে তখন কেবলমাত্র বিশ্বাস দিয়ে কিছুই হতে পারে না। প্রয়োজন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের। এ প্রসঙ্গেই তিনি Civilis Societas অভিধারণা বা কনসেপ্টটি আলোচনায় নিয়ে আসেন। Civilis Societas অর্থাৎ Civic Society এবং এ Society -তে সভ্য ও মার্জিতভাবে বসবাসের শর্তাবলী কী সে নিয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করেন। Cicero জনসাধারণের দায়িত্ব বলতে কী বুঝানো হয়, সে সম্পর্কে অত্যন্ত উন্নত এবং সম্যক ধারণা আমাদের দিয়ে গেছেন। ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের মধ্যকার পার্থক্যকেও তিনি চমৎকার স্বচ্ছতার সঙ্গেই নির্দেশ করে গেছেন। তিনি সব সময় আইনের ওপর এবং আইনের শাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাষ্ট্র হচ্ছে iuris societas অর্থাৎ Community of law. মানুষের সম্পদের সমতা বিধান করার বিষয়ে আমরা একমত না হতে পারি, মানুষের innate ability'র সমতা বিধান করা অসম্ভব, কিন্তু তার আইনগত অধিকারের একটি সমতা অন্তত বিধান করা সম্ভব। আইনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তিনি আইনকে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব এবং বাধ্যবাধকতার অর্থেই চিন্তা করতে অস্বীকার করেন। তার মতে, "True law is right reason in agreement with nature", তার মতে, "those who have reason in common must also have right reason in common" এবং

www.pathagar.com

এ থেকে Develop করেছে তাঁর conception of justice-ন্যায়বিচারের ভাবনা থেকে develop করেছে তার consciousness of love- এক মহাশক্তিশালী সামাজিক বন্ধন। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে মানুষকে ভালবাসা- "our natural inclination to love our fellowmen" থেকেই Civilis societas-এর গুরুত্ব Vis-a-vis, iuris societas এত বেশী। civilis societas বা civic society -কেই আজ civil society হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। এই কনসেপ্টটির মূল অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে যে, জন লক, রুশো এবং এডাম স্মিথ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। Natural society বা state of nature থেকে civil society টার্মটি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁদের মতে, সিভিল সোসাইটির innate rationality সমাজের মঙ্গল বা হিত সাধন করে। এখন দেখা যাক, সমাজবিজ্ঞানীরা সিভিল সোসাইটিকে কিভাবে দেখছেন। সে বিষয়ে আমরা যদি একটু পর্যালোচনা করি, বিষয়টি আমাদের কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। গোটা জিনিসটি সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্র কী ? রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন। মানুষ তার নিজের তাগিদে, নিজের প্রয়োজনে তার নিহিত গুণাবলী, প্রবৃত্তি আকাঙ্খা ও স্বপ্নের বিকাশের জন্য সে নিবিড় থেকে নিবিড়তরভাবে সংঘবদ্ধ বা একত্রিত হয়েছে। এই সংঘবদ্ধ হওয়ার সর্বোচ্চ রূপ পরিগণিত হয় রাষ্ট্রগঠনের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে এটি লক্ষ্যকরা ও অনুধাবন করার বিষয় যে, রাষ্ট্র পরস্পরবিরোধী দুটি কর্মধারার সমন্বয় সাধন করে। একদিকে রাষ্ট্র বল প্রয়োগ বা দমনমূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করে, আরেক দিকে নিয়ন্ত্রিত চিন্তাভাবনা, আচরণ প্রসারিত করতে থাকে- যাতে জনগণের স্বেচ্ছামূলক আনুগত্য সে অর্জন করতে পারে। এক কথায় রাষ্ট্র রাজনৈতিক সমাজ ও জনসমাজের ভারসাম্যেরই একটি বিশিষ্ট রূপ। রাজনৈতিক সমাজ কাকে বলে ? রাজনৈতিক দল, আইন সভা, আই প্রণেতাগণ, নির্বাচকমন্ডলী, মন্ত্রীমন্ডলী বা রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ, সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং সেসব সংগঠিত স্বার্থগোষ্ঠী যারা নিজেদের মধ্যে কোয়ালিশন গড়ে তোলে ও রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়- এসবের সমন্বিত রূপ হচ্ছে রাজনৈতিক সমাজ। আমরা জানি যে, রাষ্ট্র হচ্ছে উপরিকাঠামো। অবকাঠামো হচ্ছে অর্থনীতি। এই অর্থনৈতিক অবকাঠামো এবং রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু বিরাজ বা অবস্থান করে, এটাকেই জনসমাজ বা সিভিল সোসাইটি বলা হয়। এবং রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে, যে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ওপর ভর করে রাষ্ট্র তার চরিত্র পরিগ্রহ করে, তার দায়িত্ব সম্পাদন করে, সেই অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপযোগী করে তোলার জন্য জনসমাজের ওপর রাষ্ট্র তার কর্মকান্ড পরিচালিত

www.pathagar.com

করে এবং এ কাজ করতে রাষ্ট্রকে সংকল্পবদ্ধ থাকতে হয়। আর তা না হলে রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। এ কারণেই প্রখ্যাত ইটালীয় পন্ডিত আন্টোনিও গ্রামসি 'হেগিমোনি' বা সর্বাধিপত্যের কনসেপ্টটি নিয়ে এসেছেন। এর দ্বারা তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা হল, অর্থনেতিক অবকাঠামোর যে চরিত্র, সেটিই ধারণ করে রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামোর মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো পরিবর্তনের সূত্র অনুযায়ী ঘটতে থাকে, রাষ্ট্রকে সেই সব পরিবর্তনের সূত্র অনুযায়ী ঘটতে থাকে, রাষ্ট্রকে সেই সব পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। এ কারণেই সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজ এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। কারণ, জনসমাজের মধ্যে যদি অর্থনৈতিক অবকাঠামোর প্রতিফলন না ঘটে এবং রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে যদি জনসমাজ একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারে বা একটি অনুকূল সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে- তাহলে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। অধুনা এই সিভিল সোসাইটির দোহাই দিয়ে তৃতীয় বিশ্বে এনজিওজীবীরা এবং ডোনাররা যে নতুন প্রপঞ্চের জন্ম দেয়ার চেষ্টা করছে, তার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের নিরাকরণ সাধন করা কিংবা রাষ্ট্রকে এমন দুর্বল অবস্থায় নিয়ে যাওয়া- যাতে বৃহত্তর ভূমন্ডলীয় পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কর্মজালে রাষ্ট্রকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা সম্ভব হয়। এবং বিশ্ব পুঁজিবাদের বাজারের অংশ হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রীয় বাজারগুলো যাতে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। তৃতীয় বিশ্বে সিভিল সোসাইটির প্রবক্তারা বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যেন মনে হয়, রাষ্ট্র না থাকাটাই বোধ হয় শ্রেয়। অবশ্য এর জন্য তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের পরিগঠন পদ্ধতিটাও অনেকাংশে দায়ী। আমরা জানি যে, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে কর্তৃত্ববাদী বা অথরিটেরিয়ান গভর্ণমেন্ট গণতন্ত্রকে যেভাবে নিষ্পিষ্ট করেছে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে যেভাবে দলন করেছে, তাতে জনসমাজের মধ্যে যাা চিন্তাশীল বা সক্রিয়বাদী, তাদের পক্ষে এই কর্তৃত্ববাদী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই বা সংগ্রাম করতে গিয়ে এমন সব অবস্থান গ্রহণ করতে হয়েছে, যা সেই কর্তৃত্ববাদী, স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রের বিপক্ষেই যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, গণতন্ত্রের মূল ভিতকে নস্যাৎ করা, রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রহীন বা যেটাকে বলা যায় স্টেট অব ফ্লাকস-সেই অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। এটিকে ডোনার এজেন্সীগুলো, ইন্টারন্যাশনাল এইড ফোরামগুলো বিশেষভাবে লালন করে এজন্য যে, তারা মনে করে, এর মধ্য দিয়ে বাজার অর্থনীতির একটি বিশাল প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং যে কারণে নব্বইয়ের দশকে আমরা লক্ষ্য করি, সিভিল সোসাইটির নামে তারা বলছে যে, এনজিওগুলোই হচ্ছে গণতন্ত্রে উত্তরণের সর্বোত্তম মাধ্যম এবং এর মধ্যদিয়ে দেখা গেছে যে, সিভিক

www.pathagar.com

অর্গানাইজেশন ও সামাজিক আন্দোলনগুলোর যে কাঙ্খিত ভূমিকা অতীতে সমাজে পরিদৃষ্ট হয়েছিল, সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কম্প্রোমাইজড এবং মিনিমাইজড হয়ে গেছে।

ড. মাহবুব উল্লাহ

আপনি গ্রামসির প্রসঙ্গ এনেছেন। গ্রামসি ইটালীতে মুসোলিনীর কারাগারে ছিলেন। মুসোলিনী সেখানে একটা ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করেছিল। গ্রামসি সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবতেন। ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে পরিবর্তিত হবে সেটা তাঁর গ্রন্থের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। ইউরোপে গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে জনমত প্রকাশের যে সহনশীলতা ও স্বাধীনতা ছিল, সেই পরিস্থিতিতে ক্লাসিকাল ফর্মে বিপ্লব হওয়া সম্ভব নয়- এটাই ছিল গ্রামসির বক্তব্য এবং সে কারণে গ্রামসি সিভিল সোসাইটির কনসেপ্টটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রামসি এই সিভিল সোসাইটির সাথে পুঁজিবাদী ও উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের যে বিরোধ, সেটা সমাধানের পন্থা হিসেবে বলেছিলেন যে, এটা হচ্ছে অনেকটা ট্রেঞ্চ ওয়ারফেয়ারের মত। এটা হচ্ছে, শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যরা ট্রেঞ্চের মধ্যে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখল এবং এদিকে শত্রুপক্ষ মনে করল যে তাদের দিগ্বিজয় হয়ে গেছে। তারা উল্লাসে ফেটে পড়ল। জয়জয়কার করল। কিন্তু তখনই দেখা গেল যে, ট্রেঞ্চের ভেতর থেকে একটা প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেছে। সিভিল সোসাইটির কাজটা হচ্ছে এই ট্রেঞ্চ ওয়ারফেয়ারের মত। অর্থাৎ হেগিমনি বা কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের লড়াই, যে লড়াইটা ক্লাসিক্যাল ফর্ম অব রেভুলেশন নয়। যেটা ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবে ঘটেছিল। এখানে যেটা তত্ত্বগত প্রশ্ন এসে যায়, সেটা হচ্ছে সমাজে বাস করতে গিয়ে একজন ব্যক্তি কতগুলো মৌলিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং কতগুলো টেনশন অনুভব করে। যে ব্যক্তি হিসেবে নিজের মতো করে হয়ত কিছু করতে চায়, নিজের মতো চলতে চায়- আবার অন্যদিকে সমাজ বা রাষ্ট্র তাকে তার খেয়ালখুশি মত আচরণ করা থেকে বারণ করে বিরত করে। এই যে ব্যক্তির নিজের ইচ্ছামত কিছু করার যে চেষ্টা বা আকাংক্ষা, তার সাথে সামগ্রিক সমাজের বাধার ফলে যে ধরনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত টেনশনের সৃষ্টি হয়, এটা যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে আমরা বুঝব যে, সিভিল সোসাইটিটা কি ? একদিকে প্রত্যেকটি ব্যক্তি সমাজেরই মানুষ বা সদস্য, আবার অন্যদিকে সে সমাজ থেকে নানা ধরনের বাধারও সম্মুখীন হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে একই ব্যক্তির একদিকে যেমন একটা দ্বৈত রূপ থাকে, অন্যদিকে সে অভিন্ন একটি মানুষ। সুতরাং সিভিল সোসাইটির

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই একদিকে রাষ্ট্র, অন্যদিকে ব্যক্তি এই দুটো স্ফিয়ার এসে যায়। তো প্রাইভেট স্ফিয়ারটাকে যদি আমরা খুব ক্ষুদ্র আকারে দেখি, তাহলে আমরা সেটাকে পরিবারের গন্ডির মধ্যে দেখতে পাই। আর পাবলিক স্ফিয়ারটাকে আমরা রাষ্ট্রের মধ্যে দেখাতে পাই। মানুষ যখন পরিবারের মধ্যে বাস করে, তখন সে এক ধরনের নিজস্ব নর্মস দ্বারা পরিচালিত হয়। আর যখন পরিবার থেকে সে বেরিয়ে আসে, বৃহত্তর সমাজে যখন সে বিচরণ করে, তখন তাকে সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয় এবং সমাজ বা রাষ্ট্র যদি তার ওপর এমন সব বাধা-বন্ধন চাপিয়ে দেয়, যেটা তার স্বাভাবিক বিকাশের পথটাকে রুদ্ধ করে দেয়। সেটাকে প্রতিহত করার জন্য প্রাইভেট ইনডিভিজুয়ালরা নিজেরা কতগুলো স্বেচ্ছামূলক এসোসিয়েশন গড়ে তোলে। এই ভলান্টারী এসোসিয়েশনের প্রসঙ্গটা কেন আসছে, সেটা কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে। কারণ, ফিউডাল বা প্রাক ধনতান্ত্রিক সমাজে সিভিল সোসাইটির প্রসঙ্গ ছিল না। যিনি ফিউডাল সভরেন ছিলেন, তার কর্তৃত্বের বাইরে সমাজের কোন সদস্যের আর ভিন্ন কোন অধিকার ছিল না এবং তখনকার সমাজে যেহেতু যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি উন্নত ছিল না, সেজন্য তখনকার সমাজ বেসিকালি ছিল প্রাইমারী সোসাইটি। অর্থাৎ মানুষ কমিউনিটিতে বাস করত। এর ফলে কমিউনিটির নর্মস, নিয়মনীতি তারা মেনে চলত এবং এরা একে অপরকে চিনত, মানত। গ্রামে লক্ষ্য করা যায় যে, চাচা-ভাতিজা-মামু ইত্যাদি বলে একে অপরকে সম্বোদন করে। অথচ রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে এরা সবাই চাচা-ভাতিজা-মামু নয়। এই ধরনের সম্পর্ককে ফিখ্ট্ কিনশিপ রিলেশন বলা হয়। যেখানে এই ধরনের রিলেশনের ব্যবস্থা আছে, সেখানে সিভিল সোসাইটির প্রয়োজনীয়তা ঐভাবে উপলব্ধি হয় না এবং ভালন্টারী এসোসিয়েশন গড়ে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন নাগরিক সমাজ বিকশিত হয়, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড সোসাইটি ডেভলপ করে মানুষ জীবন-জীবিকার জন্য তার পরিবারের গন্ডি থেকে বাইরে চলে আসে, তখন লক্ষ্য করা যায়, প্রতিনিয়তই আমরা অপরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই। এটা অফিস-আদালত হতে পারে, যাতায়াতের পথে হতে পারে। যেমন ধরুন আপনি গাড়ী চালাতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আপনি কাউকে ধাক্কা দিলেন- তাকে আপনি চেনেন না। কিন্তু সেই মুহূর্তে ব্যাপারটি কিভাবে দেখতে হবে, কিভাবে এর একটা বিহিত বা সমাধান করতে হবে, সেটা সিভিল সোসাইটি আপনাকে বলে দেয় না। এখানে প্রযুক্তির প্রসঙ্গটাও খুব উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, আজকের যুগকে কেউ কেউ বলছেন ইনফরটেইনমেন্টের যুগ। ইনফরমেশন এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট- এ দুটোকে মিলিয়ে একটি শব্দ করা হয়েছে

www.pathagar.com

ইনফরটেইনমেন্ট। এখানে আমরা লক্ষ্য করছি, প্রযুক্তির বিকাশের ফলে মানুষের আনন্দ-উল্লাস করা, ব্যক্তিগতভাবে কিছু সুখময় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা এগুলো সোশালাইজড থেকে প্রাইভেটাইজড হয়ে গেছে টিভি-ভিডিওর কল্যাণে। আবার একদিকে যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি আমাদেরকে পরিবারের গন্ডির বাইরে একটা অপরিচিত জগতে নিয়ে এসেছিল এবং সেই অপরিচিত জগতে আমরা কিভাবে আচরণ করব, সে সম্পর্কে সিভিল সোসাইটির বোধটা আমাদের মধ্যে থাকা যেমন প্রয়োজন ছিল বা আছে এবং সেগুলোকে কার্যকর করার জন্য ভলান্টারী এসোসিয়েশনগুলোর যেমন একটা ভূমিকা আছে, ঠিক তার পাশাপাশি আজকে এই বিংশ শতাব্দীর শেষ মুহূর্তে এসে আমরা লক্ষ্য করছি, প্রযুক্তি যে দ্রুত গতিতে বিকশিত হচ্ছে তাতে নিউক্লিয়ারাইজেশন অফ ইনডিভিজুয়ারস হচ্ছে, এমনকি পরিবার পর্যন্ত থাকছে না। পরিবার যেখানে এক সময় পিতামাতা সন্তানকে নিয়ে গড়ে উঠতে, সেখানে দেখা যাচ্ছে এখন এক ব্যক্তির পরিবার বা গৃহস্থালি। সুতরাং এখানে আবার কিন্তু সিভিল সোসাইটির প্রসঙ্গটা অন্যভাবে আসছে। আগামী শতাব্দীর সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে পন্ডিতেরা মনে করছেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এর একটা মৃত্যু ঘটাতে পারে। যেখানে মানুষ রোবট দিয়ে কাজ করবে, টেলিফোন কম্পিউটার দিয়েই কাজ শেষ করবে এবং হিউম্যান রিলেশনশীপ বলতে কিছু থাকবে না। দৃষ্টান্ত দিয়ে যেমন বলা যেতে পারে যে, আজকে শিক্ষা বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দূরশিক্ষণ পদ্ধতি চালু হয়েছে। সেখানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাদানের একটা ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। এর দ্বারা একদিকে যেমন একসাথে বহু লোককে শিক্ষিত করা যায়, ইনফরমেশন সুবিধা দেয়া যায় তার পাশাপাশি টটো আবার আমাদেরকে একটা বিরাট জিনিস থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সেটা হচ্ছে, ছাত্র-শিক্ষক পাশাপাশি শিক্ষা দান এবং শিক্ষা অর্জন- এই প্রক্রিয়াতে যে সামাজিকতা গড়ে ওঠে, যে সামাজিকায়ন সৃষ্টি হয়, সেটার কিন্তু মৃত্যু ঘটেছে। গুরু-শিষ্যের আত্মিক বা হৃদয়ের সম্পর্কটার মৃত্যু ঘটছে। সুতরাং আমার কাছে মনে হয়েছে, আধুনিক সিভিলাইজেশনের উৎপত্তিতে সিভিল সোসাইটির প্রয়োজনীয়তা যেটা বিভিন্ন সোশ্যাল কনট্রাক্ট থিউরিতে বলা হয়েছে, আধুনিক সমাজের এই অতি উন্নত বিকাশের পর্যায়ে এসে সিভিল সোসাইটির প্রয়োজনীয়তা এখন অন্যভাবে অনুভূত হচ্ছে।

www.pathagar.com

আমি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসতে চাই। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সিভিল সোসাইটিকে কিভাবে ডোনার এজেন্সিগুলো এবং তাদের কৃপাপুষ্ট এনজিওজীবীরা দেখছেন। এরা যাকে 'সুশীল সমাজ' বলেন প্রকৃত অর্থে তা হচ্ছে এনজিও গোষ্ঠীগুলোর সমষ্টিগত পরিচয়। এ পরিচয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তি কর। সমাজের সুষ্ঠু ও সুস্থ বিকাশে বিঘ্ন ঘটাবার জন্যই এ শঠতা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ। এনজিও গোষ্ঠীগুলো সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজের অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। এই যে হঠাৎ করে ভদ্রবেশী শঠ, প্রতারক ও এনজিওজীবীরা 'সিভিল সমাজ', 'সুশীল সমাজ', অভিধায় সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজ-এর নতুন ব্যাখ্যা করার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন, তার কারণ কি ? সিভিল সোসাইটির অপব্যাখ্যা এনজিওজীবী ও তাদের ফরমায়েশী বুদ্ধিজীবীরা এভাবে দেন যে, এটি পৃথক ও স্বতন্ত্র একটি সত্তা এবং সমাজে এর একটি সুনির্দিষ্ট স্থায়ী নীতিনির্ধারনী অর্থাৎ পরোক্ষ রাজনৈতিক ভূমিকা নির্ণীত ও নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, তাদের মতে সমাজের 'সাধারণ' সসদ্যদের প্রতিনিধিত্ব করে এই 'সিভিল সোসাইটি'। অভিনব ব্যাখ্যা বটে। রাজনৈতিক দল না করেও তারা রাজনীতির নিয়ন্তা হতে চায়, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ না হয়েও তারা ক্ষমতার Linchpin হতে চায়- এদের জন্য সমাজে সকলকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলার বিকল্প হতে চায় তারা। তাহলে তো একই ব্যাপার হলো। চরিত্রগত অভিন্নতা যদি থেকেই যায় স্বাতন্ত্রে দাবী কি হাস্যকর নয়। হেগেল সিভিল সোসাইটিকে জার্মান ভাষায় Die burgliche Gesellschaft বলে অভিহিত করেছেন। "এটি এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে ব্যক্তিগণ পারিবারিক ঐক্য বিসর্জন দিয়ে অর্থনৈতিক প্রতিযোগতায় লিপ্ত রয়েছেন। এটি নির্দিষ্ট প্রয়োজন, আত্মস্বার্থ ও বিভেদের এমন একটি মন্ডল, যার আত্মবিনাশের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে"। মার্কস হেগেলের পরিভাষাটিই ধার করে সিভিল সোসাইটিকে বুর্জুয়া সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে রাষ্ট্রকে transcend করে অধিপতি শ্রেণীর স্বার্থ, ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য পায়। মার্কস-এর মতে- "Civil society embraces the whole material intercourse of individual within a definite stage of the development of productive forces. It embraces the whole commercial and industrial life of a given stage and insofar, transends the state and the nation though on the other hand, again it must assert itself in its foreign relations as nationality, inwardly must organize itself ad state... Civil society as such only develops with the bourgeoisie; the social

www.pathagar.com

organization evolving directly out of production and commerce which in all ages forms the basis of the state." মার্কসের মূল যে ধারণা রাষ্ট্র এবং জনসমাজের দ্বান্দ্বিক অবস্থান সম্পর্কে সেটি কিন্তু আজকের Liberal tradition ও অস্বীকার করতে পারছে না। জনসমাজকে লিবারেল ট্রেডিশনের দিক থেকে যদি আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি, এটি হচ্ছে এমন একটি সার্বজনিক ক্ষেত্র, যেটি পরিবার এবং রাষ্ট্রের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করে এবং নাগরিকদের যে নানা ধরনের সমিতি বা সংগঠন গড়ে ওঠে সমাজে- সেগুলোকে নিয়েই মূলত সিভিল সোসাইটি গড়ে ওঠে। এখানে স্বেচ্ছামূলকভাবে ব্যক্তিগণ যোগদান করেন, কিন্তু তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যৌথ স্বার্থ বা যৌথ কোন উদ্দেশ্য সাধন করা এবং এই সিভিল "এসোসিয়েশনগুলোর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতা ও সম্পদের যে অপব্যবহার, অসদ্ব্যবহার গড়ে ওঠে, তার বিরুদ্ধে পাল্টা একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে স্বেচ্ছাচারিতা, স্বৈরতন্ত্র কিংবা সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে নির্যাতন-নিপীড়ন বা সমাজের ওপর কোন অপচ্ছায়া জগদ্দল পাথরের মত চেপে না বসে। Aid doner'রা বলছেন জনসমাজ হচ্ছে an Aggregation of organized interests sursuinga benignand rational political agenda. এটাকে ইউনাইটেড নেশন্সের (United nations) প্রোগামের অধীনে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে এভাবে যে, সিভিল সোসাইটি হচ্ছে সেই বলয়, যেখানে সংগঠিত সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠবে। যার উদ্দেশ্য হবে বৈচিত্র্যময় এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পরবিরোধী সামাজিক শক্তির সহাবস্থান। এবং এই অবস্থানে থাকা অবস্থায় তারা তাদের সামাজিক ভিতটাকে, তাদের যে কন্সটিটিউয়েন্সি (Constituency) বা তাদের যে এরিয়া অব থিমেটিক অপারেশন, এগুলোকে তারা সংগঠিত করবেন। R.C. Riddell and A.J. Bebbington ১৯৯৫ সনে প্রকাশিত তাঁদের Developing Country NGO and Donor Governments শীর্ষক Report to the Overseast Development Adminstration-এ উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে কেন্দ্র করে যেসব জনগোষ্ঠী একত্রিত হয়, কিংবা ট্রেড ইউনিয়নগুলো বা কো-অপারেটিভ মুভমেন্টকে কেন্দ্র করে বা অন্যান্য সার্ভিস অর্গানাইজেশন বা কমিউনিটি গ্রুপ কিংবা যুব সংগঠন এমনকি একাডেমিক ইনস্টিটিউশনগুলোকে কেন্দ্র করে সমাজে যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, এসবই কিন্তু জনসমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আফ্রিকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ১৯৯৪ সনে L. Diamond তার Towards Democratic Consolidation প্রবন্ধে সিভিল সোসাইটি কিভাবে সংগঠিত হতে পারে, তার সাতটি ক্যাটাগরি দেখিয়ে দেন। তাঁর মতে প্রথম ক্যাটাগরি হচেছ ইকনমিক ক্যাটাগরি, যেখানে

www.pathagar.com

প্রডাকশন এবং কমার্শিয়াল এসোসিয়েশনের নেটওয়ার্কগুলো গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় ক্যাটাগরি হচ্ছে কালচারাল। এর মধ্যে রয়েছে ধর্মীয়, সম্প্রদায়গত এবং জাতিকতা বা জাতিসত্তা কেন্দ্রিক বিভিন্ন সমিতি বা ethnic associations. তৃতীয় ক্যাটাগরিতে তিনি বলছেন ইনফরমেশন এবং এডুকেশনাল অর্গানাইজেশনগুলোর কথা। যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ধ্যান ধারণা, মতামত এবং তথ্যের সঞ্চালন করা বা সংবহনের ব্যবস্থা করা। চতুর্থ ক্যাটাগরিতে Diamond বলছেন, এটি স্বার্থভিত্তিক গোষ্ঠী। যার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং শ্রমিক ও পেশাজীবী ইত্যাদির স্বার্থ সংরক্ষণ করা। পঞ্চম ক্যাটাগিরতেও রয়েছে Development Organization. এই ক্যাটাগরিতে Diamond এনজিওদের এবং স্বেচ্ছামূলক যে সংগঠনগুলো আছে বা Self-help Groupগুলোকে তিনি অন্তর্ভূক্ত করেছেন। ষষ্ঠ ক্যাটাগরিতে তিনি বলেছেন, Issue oriented group. বিভিন্ন ইস্যু থেকে সমাজে যেমন পরিবেশের একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে- সেগুলোকে তিনি এই ক্যাটাগরিতে ফেলেছেন এবং সবশেষে তিনি বলছেন, নাগরিক সংগঠন, Civic Organization- যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাকে সংহত, শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সঞ্চার করা, চালু করা। Diamond অবশ্য এই সব কিছুর সাথে গণ মাধ্যম এবং academic institutionগুলোকেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কারণ গণমাধ্যম এবং একাডেমিক ইনস্টিটিউশন প্রকাশনা সংস্থাসমূহ ইনফরমেশন এবং আইডিয়ার ফ্লোকে এনকারেজ করে, প্রচার করে, সংগঠিত করে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত স্বার্থের সমিতিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে না। এই জনসমাজকে যদি অর্থবহ ও কার্যকর করতে হয়, তাহলে তিনটি শর্ত পূরণ করা অপরিহার্য। ১৯৯৪-এ প্রকাশিত Civil society and political Institutions in Africa প্রবন্ধে Bratton সিভিল সোসাইটি ও পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনটি শর্তের উল্লেখ করেছেনঃ material, organizational ও ideological এবং তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, রিসোর্সের অ্যাকসেস যদি জনসমাজের না থাকে, তাহলে জনসমাজ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে Diamond যে ৭টি ক্যাটাগরির সংগঠনের কথা বলেছেন, তার মধ্যে একমাত্র ডেভেলপমেন্টাল ক্যাটাগরিতে যারা NGO কিন্তু Self-help group নয়, এইড ডোনারদের ওপর নির্ভরশীল, তারাই একমাত্র রিসোর্সের অ্যাকসেস পান এবং তাদের অঢেল অর্থের যোগান ঘটে। এর ফলে দেখা গেছে, এই এনজিওগুলো একদেশদর্শী এবং পক্ষপাতমূলক এক ধরনের আচরণ সমাজে

www.pathagar.com

করছে। তারা মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে বিকেন্দ্রীকরণ, প্রাইভেটাইজেশন, পিপলস পার্টিসিপেশন, এন্টারপ্রেনারশিপ ও স্বনির্ভরতার নামে এমন সব কর্মকান্ড পরিচালনা করছে, যেগুলোর মূল লক্ষ্য গণতন্ত্রের জন্য ভিত রচনা করা নয়। যার মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র যে ইউটিলিটি ও পাবলিক সার্ভিস জনগণকে প্রোভাইড করে, সেগুলোকে স্ট্রেংদেন করার পরিবর্তে রাষ্ট্রকে কিভাবে আরো দুর্বল করা যায় রাষ্ট্রের একটি অলটারনেটিভ ডেলিভারি সিস্টেম হিসেবে, রাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জ হিসেবে তারা নিজেদেরকে কিভাবে দাঁড় করাতে পারে, সেটিই হচ্ছে এদের মূল লক্ষ্য। এর ফলে সমাজে এবং রাষ্ট্রদেহে যে বিভাজন দেখা যায়, তা আজকে মানুষকে এনজিও বিরোধী হিসেবে তৈরী করছে। কারণ মানুষ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে যে, সিভিল সোসাইটির নামে রাষ্ট্রের ইউটিলিটি সার্ভিস, পাবলিক সার্ভিস বা কমন গুডের জন্য রাষ্ট্র যে উদ্যোগ গ্রহণ করে, এগুলোকে আন্ডারমাইও করা হচ্ছে এবং সিভিক রেসপনসিবিলিটিকে আন্ডারমাইও করা হচ্ছে। সেজন্য আজকে এনজিও এবং জনসমাজ পরস্পরবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশে এনজিওদের পক্ষে যারা বলেন যে, এনজিওরাই কেবল জনসমাজের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে এটি আসলে বাস্তবতা বিবর্জিত। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশের দু'চারটি ব্যতিক্রমধর্মী এনজিও ছাড়া অধিকাংশই আজকে জনসমাজবিরোধী একটি গোষ্ঠী হিসেবে চিত্রিত হয়েছে এবং এরা সিভিক অর্গানাইজেশনের ক্যাপাসিটিকে ইনক্রিজ করার পরিবর্তে সিভিক অর্গানাইজেশনগুলো ধ্বংসের কাজে জড়িত। নতুন নতুন সামাজিক আন্দোলন যাতে রাষ্ট্রের সিভিল এমিনিটিজ, সোস্যাল সার্ভিস এবং ইউটিলিটি সার্ভিসকে আরো এক্সপ্যান্ড করতে পারে সেক্ষেত্রে একটি সহযোগিতার হাত যাতে সিভিক অর্গানাইজেশনগুলো বাড়াতে পারে সেইদিকে অগ্রসর না হয়ে তারা রাষ্ট্রের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করছে। এর ফলে জনসমাজ এবং এনজিও'র মধ্যে একটি বিরোধ আমাদের এখানে লক্ষ্য করা গেছে এবং এর মূল কারণ হচ্ছে নব্বইয়ের দশকে যে তৃতীয় তরঙ্গ বা ঢেউ ডেমোক্রেটাইজেশনের যে third wave তৃতীয় বিশ্বে লক্ষ্য করা গেছে, তার সূত্র ধরে যেটা বলার চেষ্টা করছে পুঁজিবাদী বিশ্ব যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রাইভেটাইজেশনই হবে- টপমোস্ট প্রায়োরিটি এবং পলিটিক্যাল এজেন্ডার এক নম্বর বিষয়- সে কারণে আজকে এনজিও এই প্রাধান্য লাভ করেছে এবং এনজিও চাইছে রাষ্ট্রকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর একটি অবস্থানে নিয়ে যেতে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজ লালন, বর্ধন ও বিকাশের জন্য ১৯৯২-এ Landell-Mills Governance cultural change and Empeverment প্রবন্ধে

www.pathagar.com

যে ৪টি পূর্ব শর্তের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন তার ওপর গুরুত্ব দেয়া দরকার। এগুলো হচ্ছে ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন এর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা, শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং সেলফ এক্সপ্রেশনের ক্যাপসিটি বৃদ্ধির একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, আইনের শাসনকে সংহত করা ও শক্তিশালী করা এবং যাতে উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে, সেজন্য এসোসিয়েশনাল একটিভিটিজগুলোকে কোনোভাবে সংকুচিত না করে আরো উত্তরোত্তর ক্ষমতাশালী করার ক্ষেত্রে প্রণোদনা যোগানো।

ড. মাহবুব উল্লাহ

আমার মনে হয়, এই প্রসঙ্গে কিছু ফিলোসফিকাল মন্তব্য এসে যায়। সপ্তাদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিভিল সোসাইটির আইডিয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেটা হচ্ছে, সমাজে কিভাবে সম্ভব হবে এবং সমাজে মানুষ যে বাস করে, সে ইচ্ছামাফিক সব কিছু যে করতে পারে না, সমাজ সংগঠন তাকে বাধাগ্রস্ত করে। জন লক; এডাম ফার্গুসন, রুশো- এরা বিভিন্নভাবে এই প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক সংকট, বুদ্ধিভিত্তিক যে এনলাইটেনমেন্ট, টেননোলজির ডেভেলপমেন্ট এবং র‍্যাপিড অর্গানাইজেশন অব সোস্যাল লাইফ-এর পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এসে আরেকটা সমস্যা দেখা গেল। সেটা হচ্ছে একই প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন উঠল, যে সমাজে আমরা বাস করি, সেই সমাজটা বাস করার জন্য কতটুকু নিরাপদ এবং সেই সময় সমাজতাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানীরা ও দার্শনিকরা পথ বাতলাচ্ছিলেন যে, কিভাবে সভ্যতাকে একটা কমপ্লিট বারবারাইজেশন অব হিউম্যান এগজিসটেন্স থেকে রক্ষা করা যায় এবং তখন অবশ্য বলা হত যে সমাজের এই পরিণতির জন্য সমাজ নিজেই দায়ী। সমাজে যা ঘটছে, সেটাই দায়ী। আর আমি আধুনিক সভ্যতা বা আজকের দুনিয়া সম্পর্কে বলতে চাই ভুপেন হাজারিকার একটি গানের পংক্তি ধরে- সেটা হচ্ছে 'প্রেমহীন ভালবাসা' অর্থাৎ আজকাল মানুষের মধ্যে যে ভালবাসা বা সম্পর্ক হয়, তার মধ্যে প্রকৃত প্রেম থাকে না। আমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলছি, কিন্তু তার মধ্যে আর্ট অব কনভারসেশন ইজ ডেড। আজকে আমরা অনেকেই বহুতল ভবনে থাকি- কিন্তু একে অপরে পাশের ফ্লাটের লোকটি বা পরিবারটিকে চিনি না। সময় নেই। তো সমাজের বন্ধন এভাবে প্রচন্ড গতিতে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে এক ধরনের ক্রিপিং এলিয়েনেশন। অর্থাৎ মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং সে কারণেই সম্ভবত আজকে আবার নতুন করে মানুষের সম্পর্ক রচনা করার জন্য সত্যিকারের আন্তরিক স্বেচ্ছামূলক সংগঠন দরকার। এখন আমাদের সামনে মিলিয়ন ডলার

www.pathagar.com

কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আমাদের দেশে যে সমস্ত স্বেচ্ছামূলক সংগঠন বা এনজিও আছে তারা কতটা সমাজের এই কনসার্নের দিকে লক্ষ্য রাখছে এবং তারা কি শুধু নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে, না সমাজকে মানুষের বাসযেগ্য রাখার চেষ্টা করছে ? এটা বিরাট প্রশ্ন। কিছুদিন আগে গণসাহায্য সংস্থা নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটে গেল, সেটা আমাদেরকে সেই ইঙ্গিতই দেয়। আমার মনে হয়, আজকে এই জিএসএস জাতীয় এনজিও সব রকমের প্রতারণা, সব রকম অসামাজিকতার জন্ম দিয়েছে। নারী মুক্তি আন্দোলনের নামে নারী নির্যাতনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে বেলিল্লাপনা ও লাম্পট্যের প্রসার ঘটানো হয়েছে। সুতরাং এই ধরনের স্বেচ্ছামূলক সংগঠন আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা চাই, সমাজে সত্যিকারভাবে মানুষের সাথে মানুষের ম্রিয়মান সম্পর্ককে আবার নতুনভাবে বিনির্মাণের জন্য যে ধরনের স্বেচ্ছামূলক সংগঠন প্রয়োজন সেই ধরনের সংগঠন সমাজে গড়ে উঠুক এবং সেই দিকে সংশ্লিষ্ট সবাই আত্মনিয়োগ করুক।

লেখক পরিচিতিঃ

প্রফেসর (ড.) মাহবুব উল্লাহ, সাবেক প্রো-ভিসি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রফেসর (ড.) আফতাব আহমাদ, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাবি।

www.pathagar.com

এডাবকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক ঃ বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাই

প্রফেসর (ড.) আফতাব আহমাদ

বিশ্বব্যাপী সরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারী সংগঠনও গড়ে উঠেছে। আদিতে জনজীবনে রাষ্ট্রের সংকোচনী ক্ষমতা হ্রাস করার পদক্ষেপ গৃহীত হবার পর লক্ষ্য করা গেছে যে সমাজ জীবনে এমন অনেক খাত উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে যা সামাল দেয়া না হলে সমাজদেহে এবং শেষ বিশ্লেষণে রাষ্ট্রদেহে বৈরিতা ও বিদ্রোহের জন্ম হতে পারে। এর ফলে ভাবা হয়েছিল শাসক অভিজ্ঞ জনগোষ্ঠীর (Elitist groups) স্বার্থে গড়ে ওঠা ক্ষমতার পরিকাঠামো শুধু চ্যালেঞ্জেরই সম্মুখীন হবে না, বৈরিতা ও বিগ্রহ যে সামাজিক উদগীরণের জন্ম দেবে তাতে ক্ষমতার ঐ পরিকাঠামো ভেঙ্গে তছনছ হয়েও যেতে পারে। এমনিতেই আধুনিক বুর্জোয়া তথা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্থ ও বিত্তের স্বার্থ ও চাপগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণেই সদা ব্যতিব্যস্ত থাকে। কারণ এদেরই তৈরী আইন, বিধি-বিধান ও প্রচল রাষ্ট্রাচারে পরিণত হয় এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সরহাদ নির্ধারণ করে থাকে। বেকার, পুষ্টিহীন ও দারিদ্র্য-পীড়িত যুব সমাজ ও জনসাধারণ রাষ্ট্র বিধ্বংসী অর্থাৎ অন্তিমান রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বিধ্বংসী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্ভাব্য রিক্রুটে পরিণত হতে পারে। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় প্রথম দিকে বেশ কিছু সংখ্যক জনহিতৈষীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে ওঠে, যা এখন ভূ-মন্ডলীয় পরিধি অর্জন করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল, রোটারী ইন্টারন্যাশনাল, জেসিস, জোন্টা ক্লাব ইত্যাদি। এর পাশাপাশি আমেরিকার দক্ষিণ গোলার্ধে মনরো ডকট্রিনের প্রয়োগকে গ্রহণীয় ও সহনীয় করে তোলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে ধর্ম, কৃষ্টি, সামাজিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা ধরনের বেসরকারী সংগঠনের উদ্ভব হয়। বলাই বাহুল্য এসব সংগঠনের মানবহিতৈষী কার্যক্রমের আড়ালে মূলতঃ যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা স্থাপনের পক্ষে নজরদারী, গুপ্তচরবৃত্তি এবং প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করাটাই ছিলো মূল এ্যাজেন্ডা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ও স্নায়ুযুদ্ধের যুগে সারা বিশ্বে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা শুরু করলো নানা ধরনের বেসরকারী সংগঠন বা এনজিও। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই এনজিওগুলো পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমে প্রচারণার কৌলিন্যে বিশেষ মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়। নয়া ঔপনিবেশিক শৃংঙ্খলে আবদ্ধ

www.pathagar.com

থাকা এসব নিম-সার্বভৌম দেশগুলোতে দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অনুপস্থিতিতে দুরাচারী দালাল শাসকগোষ্ঠী লুন্ঠন ও দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। তার ফলে দুর্নীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ষোলকলায় পূর্ণ হয়। এ অবস্থায় পুঁজিবাদের হৃদ্বেষী (Metropolitan) রাষ্ট্রগুলো থেকে ক্ষমতাসীন অভিজনগোষ্ঠী ও খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকগণ দাতাগোষ্ঠীসমূহের কিছু কিছু এসব দেশে এসে হাজির হয়। উদ্দেশ্য বেকারত্ব দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, নিরক্ষরতার অবসান, পরিমাণে স্বল্প হলেও পুঁজির যোগান, নিঃসম্বল ও ভূমিহীনদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, নারী-পুরুষ বৈষম্যের অবসান ও নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি। এর সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে যে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে প্রচারণার অগ্রভাগে নিয়ে আসা হয় তা হলো রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারের ন্যূনতম যে কার্যাবলী সম্পাদন করার কথা, তা সরকার সম্পাদনে অক্ষম, আর তাই এনজিওগুলোকে চিত্রিত করার চেষ্টা হয়- Alternative better and effective delivery system হিসেবে। এটি যে অরটারনেটিভ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে বেটার ইফেক্টিভ ডেলিভারী সিস্টেম কিনা তা শত সহস্র কোটি টাকা মূল্যমানের এক প্রশ্ন।

লায়ন, রোটারী, জেসিস, জোন্টা ইত্যাদির জন্ম খোদ যুক্তরাষ্ট্রে। নিজ দেশে আদিতে এসব সংগঠন Slum dwellers বা বস্তিবাসীগণ Squaters অর্থাৎ যারা যেখানেই সুযোগ-সুবিধা করে নিতে পারে সেখানেই মাথা গোঁজার ঠাই করে নেয় যে জনগোষ্ঠী এবং Black ghettos বা হতদরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গদের নিকৃষ্ট এলাকায় একীভূতভাবে বসবাসের জন্য গড়ে তোলা বস্তি এসবকে কেন্দ্র করে কাজ করতো। চৌর্যবৃত্তি, মাদকাসক্তি, যৌন নির্যাতন, যৌন ব্যভিচার, মাফিয়াচক্রের হয়ে ব্যাংক লুট, খুন, ডাকাতি ইত্যাদি অর্থনীতি বিনাশী ও সমাজ বিধ্বংসী কার্যকলাপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র ও সমাজের পরিকাঠামো এবং ক্ষমতার ভারসাম্য ও স্থিতাবস্থাকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছিলো। এসব এনজিও'র কার্যক্রমের ফলে পরিস্থিতি অনেকটা আয়ত্বের মধ্যে চলে আসে। ওদিকে পুঁজিবাদ বিরোধী সাম্যবাদী বিপ্লবী তত্ত্ব বা তৎপরতা যুক্তরাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীর জন্য মহা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লায়ন, রোটারী ইত্যাদি এনজিও বিভিন্ন স্কলারশিপ, গ্রান্ট, এনডাওমেন্ট, ট্রাস্ট ও অন্যান্য প্রকল্পসহ নানা কলা কৌশলে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন অনাত্মগোষ্ঠীগুলোকে আদর্শের বিষয়ে উদাসীন ও অনীহাযুক্ত এবং যুগপৎভাবে রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে ভাবলেশহীন ও তাৎক্ষণিকতায় বিশ্বাসী যে গোষ্ঠী বা 'অ্যানোমিক' গ্রুপ এ ধরনের সামাজিক স্থিতিশীলতা বিরোধী ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বে আস্থাহীন সিস্টেম বিরোধীদেরকে পর্যায়ক্রমে সমাজে কো-অপট করে নেয়া হয়।। নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

সমস্যার একটি সুরাহা করে এসব সংগঠন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের নয়া ঔপনিবেশিক নিম-সার্বভৌম দেশগুলোতে। লায়ন-রোটারী ইত্যাদির দেখাদেখি গোড়াতে যারা এসব সংগঠনে প্রবেশাধিকার লাভে ব্যর্থ হয় তারাও পরবর্তীতে ধান্ধাবাজ সোস্যাল ড্রপআউটস দেশজ জনবলভিত্তিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্পন্সরদের পরামর্শে ও উদ্ভাবিত কাঠামো কৌশলের ভিত্তিতে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য NGO জন্মলাভ করে। এর পাশাপাশি তেমন সফল একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, অথচ পৈতৃক কিংবা শ্বশুরের অর্থবিত্তের কল্যাণে কিংবা বন্ধু-বান্ধবের কল্যাণে বা অনুগ্রহে বিদেশ পাড়ি দেওয়ার পর এখান সেখান থেকে ডক্টরেট ডিগ্রীসহ বিভিন্ন ডিগ্রী ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট হাতিয়ে দেশে এসে বাহাবা কুড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। 'কী ইনুরে' ভাব নিয়ে চলা এসব উন্নাসিকেরা ক্ষমতার নানা চোরাগলি ও অলিন্দে ঘোরাফেরা ও চক্কর দিয়ে ঠিকই বিদেশী প্রভু খুঁজে নেয়। তারপরই উন্মোচিত হয় এদের নিজস্ব দোকানের ঝাঁপি- চটকদার রমরমা NGO। তৃতীয় বিশ্বে নিয়োজিত বিভিন্ন গোয়েন্দা কর্মজাল সমাজের নানা স্তর থেকে চর নিয়োগী ও মুৎসুদ্দী রিক্রুট করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্নবান। এদের টার্গেট প্রধানত হঠকারি রাজনীতিতে বিশেষ করে বাম ধারার আত্মঘাতী রাজনীতিতে হতাশ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া কর্মী সমর্থক গোষ্ঠী। দেশের গণবিরোধী ও জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী রাষ্ট্রঘাতী চক্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী টার্গেট তালিকায় গুরুত্বের সঙ্গে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পুষ্টিহীনতা দূরীকরণ, দারিদ্র্যবিমোচন, নাগরিক সচেতনতা বিনির্মাণ, নারীর ক্ষমতায়ন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আধুনিকতামন্য করে তোলা এবং এই নিমিত্তে ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক মূল্যবোধ ও কৃষ্টিকে অস্বীকার করে এক বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল ও নীতিবোধহীন অনৈতিক জীবনযাপনকে উৎসাহিত করার আড়ালে এসব NGO মূলতঃ দেশে দেশে নাশকতামূলক ও অন্তর্ঘাতমূলক রাষ্ট্রঘাতী তৎপরতা এবং বৃদ্ধিবৃত্তিক অযাচার ও চৌর্যবৃত্তিকে আগ্রাসী উৎসাহ দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে NGO কার্যক্রম ছিটেফোঁটাভাবে স্বাধীনতাপূর্বকালে পল্লী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পর এ দেশে রাতারাতি অনেক NGO জন্মলাভ করেছে যার সঙ্গে দেশহিতকর ও জনহিতকর কোন কর্মের সম্পর্ক নেই। আমাদের NGOগুলোর মধ্যে বিশেষ করে 'প্রশিকা', 'নিজেরা করি', 'প্রিপট্রাস্ট'সহ বিশ কিছু এনজিও এবং এদের অনুগ্রহপুষ্ট সাবকন্ট্রাক্ট লাভকারী ছোট ছোট NGOগুলো সরাসরি এদেশে ভারতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভূ-রণনৈতিক স্বার্থকে

www.pathagar.com

সংরক্ষণে যত্নবান, সচেষ্ট ও উদ্যোগী। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'সহ ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মজালের সঙ্গে রয়েছে এদের নিবিড় সম্পর্ক। তৃণমূল পর্যায়ে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার নামে দেশব্যাপী এরা অন্তর্ঘাতমূলক ও নাশকতামূলক কর্মকান্ডে জড়িত। সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে আমাদের ধর্মবিশ্বাস, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও কৃষ্টিকে বিপর্যস্ত করে আমাদেরকে ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ ইতিহাস বিবর্জিত একটি শূন্যগর্ভ জাতিতে পরিণত করার গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে এরা লিপ্ত। নিরক্ষর, দরিদ্র, অসহায়, বেকার ও দুস্থজনদের উদ্ধার করার নামে এরা ভারতসহ পাশ্চাত্যের নানা দেমে ও সেইসব দেমের উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে সরাসরি অর্থ লাভ করে। অর্থের বিপুল অংশ তারা তাদের আত্মোন্নয়ন, ব্যক্তিগত ঠাঁটবাট ও সমৃদ্ধির কাজে ব্যয় করার জন্য তসরুপ করে থাকে। যারা এদের অর্থ যোগান দেয় ক্ষেত্রবিশেষে সেইসব প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মাব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গোপনে লেনদেনও এরা করে থাকে। আর তাই অর্থ যোগানদারদের মন যুগিয়ে ভূয়া প্রকল্পের তথ্যাদির স্ফীত খরচ দেখিয়ে ভূয়া অডিট রিপোর্ট জমা দিয়ে এরা ইতোমধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিপুল অর্থবিত্ত ও বৈভবের মালিক হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা এদের যা রয়েছে চাকরির ন্যূনতম হারে মাইনে পাওয়ার সুযোগ অর্জনেও এরা অক্ষম। অথচ বিশাল বাড়ী, অত্যাধুনিক গাড়ী ও মোটা মাইনে নিয়ে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে মুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয়ার নামে গোটা সমাজকে এরা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও ঠাট্টা-মশকরা করছে। এ এক নির্মম তামাশাই বটে। সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে এদের কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই। NGO ব্যুরো নামে একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা রয়েছে বটে, কিন্তু তার আইনী ও সাংবিধানিক ক্ষমতা তো নেই-ই, এনজিওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে জবাবদিহি ও দায়বদ্ধ হতে বাধ্য করার কোন ক্ষমতাও এই ব্যুরোর নেই। দেশের কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের কোন এখতিয়ার নেই। NGOদের অর্থায়নের উৎস ও আর্থিক লেনদেনের অডিট করার কোন সুযোগও আইন তাঁকে দেয়নি।

আমাদের দেশের NGOগুলো বিশেষ করে 'প্রশিকা' ও 'নিজেরা করি'র নেতৃত্বাধীন পঞ্চভূতের যে দৃষ্টচক্র অন্যান্য NGOদের মাথায় চাট্টি মেরে বেড়িয়ে গত এক দশক ধরে সরাসরি রাজনীতিতে শুধু নাক গলাচ্ছেই না, সম্প্রসারণবাদী ভারতের অনুগ্রহ ও কৃপাপুষ্ট এদেশীয় দলবিশেষের পক্ষে জনমত তৈরী ও দেশপ্রেমিক জনগণকে বিভ্রান্ত করার কাজেও ন্যক্কারজনকভাবে জড়িয়ে পড়েছে। 'প্রশিকা'র নেতৃত্বাধীন পঞ্চভূতের দৃষ্টচক্রের কার্যাবলীর বিরুদ্ধে NGOগুলোর মধ্যেও প্রবল অসন্তোষ ও ভিন্নমত রয়েছে। NGOগুলো নিজস্ব একটি সমিতি

www.pathagar.com

গঠন করে 'প্রশিকা' ও 'নিজেরা করি'র পঞ্চভূতের আধিপত্য ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ NGOগুলোর এই সমিতি 'অ্যাসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস অব বাংলাদেশে' সংক্ষেপে এডাব নামে পরিচিত। এ পর্যন্ত 'প্রশিকা'র গণধিকৃত কাজী ফারুক আহমদ ও তার লেজুড়দের আশীর্বাদ ও সমর্থন ছাড়া কেউই এডাবের প্রধান কর্মকর্তা হতে পারেনি। এডাবের গত একদশকের কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, দারিদ্র্য বিমোচনের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ 'নারীর ক্ষমতায়নের' নামে যৌন ব্যভিচার, 'মুক্তবুদ্ধি চর্চার' নামে ইসলাম বিরোধী বিদ্বেষ প্রচার, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' নামে ভারত তোষণ ও ভারতের মাহাত্ম্য কীর্তন, 'বাঙ্গালী সংস্কৃতি উৎসবের' নামে ভারতীয় সংস্কৃতির আনুগত্য এবং যুগপৎভাবে সেই সাথে অযাচার ও বেলেল্লাপনাকে উৎসাহদান-সর্বোপরি ভারতীয় পঞ্চম বাহিনী তথা ভারতের অনুগ্রহ ও কৃপাপুষ্ট আওয়ামী লীগের পক্ষাবলম্বন করা ছাড়া এডাবের কোন ইতিবাচক ও অর্থবহ কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়নি ও দৃশ্যমান নয়। উপরোন্তু ভারত প্রস্তাবিত বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী যেসব রাষ্ট্রঘাতী প্রকল্প আওয়ামী লীগের মাধ্যমে এদেশে ফেরি করার চেষ্টা হয়েছে। 'সুশীল সমাজ'-এর দোহাই পেড়ে এডাব সেসব রাষ্ট্রঘাতী প্রকল্পকে যৌক্তিক ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে প্রমাণ করার অপচেষ্টা চালিয়ে তার ঘৃণ্য তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। 'দিল্লী পছন্দ' এই 'মুশকিল আসান' গোষ্ঠী এডাবের নামের আড়ালে NGOগুলোকেই এদেশের তথাকথিত 'সুশীল সমাজ' বলে প্রমাণ করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সিভিল সোসাইটি বলতে যেখানে সার্বজনীনভাবে জনসমাজকে বোঝায় কিংবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি যাকে পুরসমাজ বলে অভিহিত করেছেন তাকেই এডাবের ইঁচড়েপাকারা তাদের পরিপোষকগণ যখন 'সুশীল সমাজ' বলে অভিহিত করেন তখন তো আমরা নিশ্চিতভাবে ভাবতে পারি যে, ঐ তথাকথিত 'সুশীল সমাজের' বিপরীতে একটি দুঃশীল সমাজও রয়েছে। পৌরনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ন্যূনতম সবক যাদের জানা আছে তারা জানেন যে, সভ্যজগতে সমাজের দ্বিভাজন রাজনৈতিক সমাজও জনসমাজের রূপ পরিগ্রহ করেছে। আসলে অর্থ তসরুফকারী এডাবওয়ালারা ও বিভিন্ন NGO গোষ্ঠী স্বচ্ছতার পরিবর্তে তমসার আবরণের আড়ালে সমাজদ্রোহী ও মানবিকতার বৈরী যেসব কর্মকান্ড করছে সেসবের হিসেব নিকেশ নেয়ার অধিকার এদেশের সর্বসাধারণের আছে। আমরা এডাবসহ সকল এনজিও'র অর্থায়নের উৎস ও আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখতে চাই। কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল সেই ক্ষমতাদানের আইনী ব্যবস্থা করা হোক। আইন করে এসব

www.pathagar.com

NGO-কে বাধ্য করা হোক তাদের অডিট রিপোর্ট ও কর্মতৎপরতার এনজিও ব্যুরো কর্তৃক মূল্যায়ন রিপোর্টও যেন জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়।

অনেকে ভাববেন হঠাৎ এনজিওদের বিরুদ্ধে আমি এত মারমুখো হয়ে উঠলাম কেন। সৎ, নিষ্ঠাবান, নিবেদিতপ্রাণ ও একাগ্র এনজিও সম্মানজনক ব্যতিক্রম হিসেবে যে আমাদের সমাজে বিরাজ করছে না ও কাজ করছে না তা নয়। আমি তাদের সাধুবাদ জানাই এবং তাদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি নিয়ে যেসব মতলববাজ ধান্দাল এনজিও আমাদের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রঘাতী তৎপরতায় লিপ্ত তাদেরকে কোনভাবেই বরদাশত করা যায় না ও রেহাই দেয়া যায় না। গত সাধারণ নির্বাচনে এডাবের মাধ্যমে ভারতীয়রা যে কলকাঠি নেড়েছে ও সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে তার প্রমাণ হাতেনাতে ধরা পড়েছে গত সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে (৩০ আগস্ট, ২০০১ ইং)। আমাদের সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশ রাইফেলস ভারত থেকে ফেনীর পাদুয়া সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করা একটি ট্রাককে ধাওয়া করে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নিজকুঞ্জরার সমিতির বাজারের কাছে আটক করতে সক্ষম হয় (ট্রাকটির নাম্বার ফলক হচ্ছেঃ ঢাকা-ট-২৯৮৮)। ট্রাকটির ড্রাইভার ও কয়েকজন আরোহী দুর্ভাগ্যক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ট্রাকটিতে তল্লাশি চালিয়ে অনেক চোরাইমালের মধ্যে এক লাখ গোপন রাজনৈতিক প্রচার পুস্তিকা ও দু'লাখ রাজনৈতিক পোস্টার উদ্ধার করা হয়েছে। ভারতে মুদ্রিত এসব প্রচার পুস্তিকা ও পোস্টারের প্রিন্টার লাইনে ছাপা রয়েছে, 'এডাব কর্তৃক ১/৩-এফ, লালমাটিয়া, ১৬৬, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। প্রকাশকাল এপ্রিল ২০০১। পোস্টার এবং পুস্তিকাগুলোতে এদেশের জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী কৃষ্টি ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের চরম উস্কানিমূলক ও ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য, শ্লোগান ও ব্যঙ্গাত্মক চিত্র রয়েছে। এডাবের তৎকালীন চেয়ারপার্সন খুশি কবির সাংঘাতিক ইসলাম বিদ্বেষী ও জাতীয়তাবাদ বিরোধী ভারতীয় সংস্কৃতির পূজারী একজন 'বিশিষ্ট নারী নেত্রী'। এডাবের এ ধরনের সমাজদ্রোহী, জাতিদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মতৎপরতার মুখে সরকারের নির্লিপ্ত থাকার কোন সুযোগ নেই। খুশি কবিরের দেশীয় মুরুব্বী হচ্ছে বহু অঘটন ঘটন পটিয়সী প্রশিকার কাজী ফারুক আহমদ। প্রশিকার অন্তর্গত চার-পাঁচটি শাখা সংস্থাকে পৃথক স্বতন্ত্র NGO দেখিয়ে বিদেশের অঢেল অর্থ লুটপাট করেও বিদেশীদের কম বিরাগভাজন হননি এই ব্যক্তি। কিন্তু ভারতীয়দের দাক্ষিণ্যে ও আওয়ামী লীগের কৃপায় এখনও তিনি বেশ টিকে আছেন। অবশ্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বীর জনগণ এই ব্যক্তিটিকে বেলেল্লাপনার অপরাধে বেধড়ক পিটিয়ে সমুচিত শিক্ষাই দিয়েছে। পৈতৃক প্রাণটি রক্ষা করে

www.pathagar.com

কোন রকমে ঢাকায় পালিয়ে এসে অনেক শোরগোল করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খুব একটা সুবিধে করে উঠতে পারেনি। গণসাহায্য সংস্থা বা জিএসএস-এর প্রধান কর্তা ফ.র.ম. হাসান যিনি 'ফ্রড্ডু' হাসান নামেই অধিক পরিচিত- ব্যভিচার, নারী নিপীড়ন ও যৌন হয়রানির ক্ষেত্রে লাম্পট্যের সকল সীমা পেরিয়ে রাজধানীতে বেশ মশহুর হয়ে উঠেছিলেন। এক পর্যায়ে 'ফ্রড্ডু' হাসানের দূরাচর ও ব্যভিচার ফাঁস হয়ে গেলে পরিণতিতে তার জিএসএসকে বন্ধ করে দেয়া হয় ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ফ্রড্ডু হাসান অনেক বুদ্ধিরজীবকে যৌনতৃপ্তি লাভের বহু বিচিত্র সুযোগও করে দিয়েছিলেন বলে নানা মহল থেকে অভিযোগ রয়েছে। অর্থ তসরুপের কথা ও প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পাহাড় গড়ার কথা নাইবা উল্লেখ করলাম। অবাক বিস্ময়ে শুনতে পেলাম কতিপয় বুদ্ধিজীবের তদ্বিরে 'ফ্রড্ডু' হাসানের জিএসএস-এর ওপর থেকে আওয়ামী লীগ সরকার বিদায়ের শেষ লগ্নে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে গেছে। এ আমাদের দুর্ভাগ্য।

এডাবের সর্বশেষ দুষ্কর্ম ধরা পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে আমি দাবী করছি- হয় এডাবকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হোক, না হয় এর সাংগঠনিক কাঠামো বিলুপ্ত করে NGO ব্যুরোর তরফ থেকে একজন গ্রহণযোগ্য প্রশাসককে নিয়োগ করা হোক। ভারত থেকে পুস্তিকা ও পোস্টার গোপনে ছেপে চোরাই পথে বাংলাদেশে আনার অপরাধে এডাবের তৎকালীণ চেয়ারপার্সন খুশি কবিরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক। সেই সাথে এডাবসহ কাজী ফারুক ও তার 'প্রশিকা'র নেতৃত্বাধীন NGO মহলের পঞ্চভূতের দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত ও ব্যুরো অব অ্যান্টি করাপ্শনের তদন্ত অতিসত্বর শুরু করা হোক।

লেখকঃ প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সৌজন্যঃ দৈনিক ইনকিলাব

www.pathagar.com

এনজিওদেরকে ব্যাংকিং ব্যবসা থেকে বিরত রাখা উচিত

প্রফেসর আবু আহমেদ

যে কোন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স নিয়ে ব্যাংক ব্যবসা করতে পারে। তবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিছু প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে জনগণ থেকে অর্থ আদায় করে এবং আবার জনগণের মধ্যেই সুদে সে অর্থকে ব্যবহার করছে। এসব প্রতিষ্ঠান এক ধরনের এনজিও, এরা কথিত মাইক্রো বা ক্ষুদে ক্রেডিট দিয়ে জনগণকে সাহায্য করছে বলে বলা হয়। ব্যাংক হলে ঐ প্রতিষ্ঠান ডিপোজিট বা আমানত গ্রহণ করে এবং গ্রাহককে ঋণ দেয়, সে ঋণ চাই মাইক্রো হোক, বা বড় হোক। আর এনজিও যখন একই কাজ করে তখন তারা ডিপোজিট শব্দটা ব্যবহার করে না, তবে ক্রেডিট বা ঋণ শব্দটা ব্যবহার করে।

অর্থের উৎস যদি জনগণ না হয়ে বহির্সূত্র হতো তাহলে ঐ ধরনের আর্থিক লেনদেন ব্যাংকিং নিয়মের মধ্যে নাও পড়তে পারতো। কিন্তু অর্থের উৎস যখন জনগণ হয় আর সে অর্থ আবার চড়া সুদে জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হয় তাহলে সেটা ব্যাংক যা করে সে পর্যায়েই পড়ে, শুধু নামটা ব্যাংকিং নয়।

আমাদের আইনে কোন প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক হতে হলে ১৯৯১-এর ব্যাংকিং এ্যাক্টের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স নিতে হয়। কিছু এনজিও এ কাজটি না করে প্রকারান্তরে ব্যাংকিং ব্যবসা করছে। এ পথে যাওয়ার জন্য তারা কৌশল হিসেবে সদস্যদের থেকে জমা গ্রহণ ও সদস্যদেরকে ঋণ প্রদান পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। দেখতে হবে সদস্যদেরকে কি দেওয়া হচ্ছে। সেখানেও হয় সুদ না হয় মুনাফা। আর যাদেরকে ঋণ দিচ্ছে তাদের থেকে আদায় করা হচ্ছে সুদ। কিছু প্রতিষ্ঠান সমবায় আইনের অধীনে নিবন্ধিত হয়ে সদস্যদের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের কৌশলে প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের ব্যবসা করে যাচ্ছে। ঐ ব্যবসায় মুনাফার অংশীদার সব সদস্য না হয়ে কিছু সদস্য হয়। এসব প্রতিষ্ঠান নানাবিধ ক্রেডিট ইউনিয়ন ও ক্রেডিট সোসাইটির নামে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এগুলোর তথাকথিত মুনাফা, যা অন্য অর্থে সুদ, প্রদানের হার আরো বেশি এবং যে সমস্ত গ্রাহকদেরকে এরা লোন (Loan) দেয় সে লোনের সুদের হারও বেশি।

সাধারণ ব্যাংকিং চ্যানেল থেকে অনেকে লোন নিতে পারে না বলে এসব ক্রেডিট ইউনিয়ন বা সোসাইটিগুলোর কাছে গিয়ে হাজির হয় ঋণ নেয়ার জন্য। গ্রামাঞ্চলে এবং দরিদ্র সেবার নামে কিছু এনজিও এক ধরনের সুদী ব্যবসা করে চলেছে।

www.pathagar.com

তারা যে আর্থিক লেনদেন করছে ঐসব ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক মোটেই অবহিত নয়। কোনো এনজিও যদি অনেক অনেক কোটি টাকা তাদের কথিত সদস্যদের থেকে নিয়ে সরে যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের কি কিছু বলার আছে ? সংগঠিত অবস্থায় আর্থিক লেনদেনের ব্যবসা করলে সেটা অবশ্যই রেগুলেটরের, এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতায় আসতে হবে।

সমবায় আইনে ও ব্যাংকিং আইনের মধ্যে অর্থগ্রহণের এবং কর্জ প্রদানের রীতি-নীতিই ভিন্ন। সমবায় আইনে নিবন্ধিত হয়ে যারা অর্থের ব্যবসা করছে তারা তাদের সীমা লঙ্ঘন করছে কিনা সেটাও পরীক্ষা করে দেখা দরকার। আমার জানা মতে সমবায় সদস্যরা একত্রে কোন ব্যবসা করার জন্য চাঁদা দিতে পারে এবং ঐ চাঁদা থেকে সদস্যদেরকে ঋণও দেওয়া যেতে পারে। এ স্বাধীনতা আবার ব্যাংকিং-এর রূপ ধারণ করলে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই বিধি-নিষেধ আরোপ করা উচিত।

অতি সম্প্রতি দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই এনজিওগুলো কর্তৃক ব্যাংকিং করার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তব্য দিয়েছে। তাদের ঐ প্রতিবাদের মধ্যে যুক্তি আছে। ব্যাংকিং আইনের বাইরে চাঁদার নামে আমানত সংগ্রহ আর মাইক্রো ক্রেডিটের নামে সুদে লোন (Loan) দেওয়া প্রকারান্তরে অর্থের মধ্যস্থতাকরণের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু নামটা দেওয়া হচ্ছে মাইক্রো ক্রেডিট কার্যক্রম। ব্যাংকিং আইনকে পাশ কাটিয়ে এ ধরনের ব্যবসা করলে মুনাফার ওপর আয়কর দিতে হয় না। এখন ব্যাংকিং কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে করপোরেট ইনকাম ট্যাক্স ৩৫%, অর্থাৎ ১০০ টাকা কোন ব্যাংকিং কোম্পানী লাভ করলে ৩৫ টাকা সরকারকে দিতে হয় আয়কর বাবদ। এটাই হলো একটা বড়ো কারণ যে জন্যে ব্যবসা সংগঠনগুলো কর্তৃক এনজিওগুলো কর্তৃক বেনামিতে ব্যাংকিং করার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে সরকারকেও দেখতে হবে জনগণের স্বার্থ। কোন এনজিও যদি তাদের হাজার হাজার সদস্যদের থেকে ফি নিয়ে পরে ব্যবসা ব্যর্থতার নামে কেটে পড়ে তাহলে সে দায়িত্ব কে নেবে?

আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বেশি স্বাধীনতা ভালো নয়। আলবেনিয়া পূর্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল। সমাজতন্ত্র থেকে তারা যখন বাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও অনেক বেশি স্বাধীনতা পেলো। সে স্বাধীনতা পেয়ে রাতারাতি এমন এমন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো সেগুলো জনগণ থেকে বেশি বেশি মুনাফা দেবে এ প্রতিজ্ঞা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করলো। শেষ পর্যন্ত ঐ

www.pathagar.com

কথিত বেশি মুনাফা আর দেওয়া হলো না, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলো সাইনবোর্ড নামিয়ে সরে পড়লো। যারা অর্থ জমা দিয়েছিল বা কথিত বিনিয়োগ করেছিল তারা অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে পড়লো, ঐ নেমে পড়া সিভিল রায়টের রূপ নিলো, সরকারের পতন হলো, কিন্তু জনগণ তাদের অর্থ ফেরত পায়নি। ঐ অবস্থা, তবে একটু নিম্নস্তরে, রাশিয়ায়ও হয়েছিল। সমাজতন্ত্র-উত্তর রাশিয়ান ফেডারেশনে যে সব এমন এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো যাদের কাজই ছিল বেশি মুনাফার প্রতিজ্ঞা করে জনগণ থেকে অর্থ নেওয়া। রাশিয়ায়ও জনগণ অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য ছোটখাটো দাঙ্গা করেছিল।

আমাদের অর্থনীতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার বেশি নজির নেই। তবে এনজিওদের মুনাফা প্রদানের ব্যর্থতা অনেক আছে। দারিদ্র্য সেবার নামে এখন কিছু কিছু এনজিও ব্যবসায় নেমে পড়েছে। ব্যবসা করতে আপত্তি নেই, তবে সে ক্ষেত্রে সেজন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে এবং নিয়মানুযায়ী ট্যাক্স দিতে হবে। অনেক এনজিও বিদেশ থেকে অর্থ পাচ্ছে এবং অনেকে এটাও মনে করে যে বিদেশে যারা এনজিওদের অর্থদাতা হচ্ছেন তারা এনজিওদের সুদের ব্যবসার মাধ্যমে নিজেদের জন্যই ব্যবসা করছেন। এনজিওদের অর্থ প্রবাহ স্বাধীন সংস্থা দ্বারা পরীক্ষিত ও নিরক্ষীত হওয়া উচিত, বিশেষ করে যেগুলো মাইক্রো ক্রেডিট (Micro Credit) প্রোগ্রামের সঙ্গে জড়িত।

দেশে এনজিওগুলো এখন এনজিও ব্যুরো কর্তৃক সুপারভাইজড হয়। এনজিও ক্ষেত্র বিশেষ নিবন্ধনের সনদপত্র প্রদান করে। কিন্তু ব্যাপক আর্থিক-লেনদেনের ওপর খবরদারি করার এখতিয়ার এবং ক্ষমতা এনজিও ব্যুরোর নেই। যেহেতু দেশে এখন কয়েকশ এনজিও আছে এবং যেহেতু ঐগুলোর কার্যক্রম বিস্তৃতি হচ্ছে সেজন্য এনজিওগুলোর কার্যক্রমের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ রিগুলেশন রুল হওয়া উচিত। ঐ রেগুলেশনই বলে দেবে ব্যবস্থাপনা বোর্ড বা কাউন্সিল কেমন হবে। বোর্ড বা কাউন্সিলের দায়িত্ব কি, অর্থের উৎস ও ব্যবহার কেমন হবে, কোথায় এনজিওদেরকে ট্যাক্স দিতে হবে, উঁচু সংগঠকদের বেতন-ভাতা কতো হবে ইত্যাদি।

তবে এনজিওগুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য এনজিও ব্যুরোর বর্তমান কাঠামো উপযুক্ত নয়। এনজিও ব্যুরোর স্থলে একটি পুর্ণাঙ্গ অথরিটি বা কমিশন গঠন করা উচিত সংসদের আইনের মাধ্যমে। বর্তমানে যেটা বড়ো সমস্যা সেটা হলো এনজিওগুলো যা করছে তারমধ্যে এবং ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কারণের অভাব। কোনটা ব্যবসা, কোনটা এনজিও সেবা এ পার্থক্যই যেন অনেকটা

www.pathagar.com

গুলিয়ে গেছে। আমরা যদি ব্যবসা এবং সেবা, ব্যবসা এবং নন-প্রফিট ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য বেঁধে দিতে না পারি তাহলে অনেকেই স্বাভাবিক ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এনজিও ব্যবসা করতে চাইবে। ইতোমধ্যে দেশের এনজিওগুলো বড়ো বাজেটের উন্নয়ন ও ক্রেডিট প্রোগ্রাম নিয়ে অর্থনীতিতে নেমেছে। তাদের কার্যকলাপকে রেগুলেট ও সুপারভাইজ করার জন্য যদি কোন উপযুক্ত অথরিটি না থাকে তাহলে এনজিওগুলো হবে জনগণকে শোষণ করার বড়ো হাতিয়ার। ইতোমধ্যে একটা বড়ো এনজিও ব্যাংক স্থাপন করতে চেয়েছে, কিন্তু সে স্থাপন করাটা ব্যাংকিং আইনে না চেয়ে সোসাইটি বা সমাজকল্যাণ বিষয়ক আইনের আওতায় চেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এ ধরনের দরখাস্তকে অনুমোদন দিতে পারে না। ঐ এনজিওর ব্যাংক ব্যবসার বিরুদ্ধে একজন সিনিয়র অধ্যাপক একটা মামলাও করেছেন। মামলা করার পিছনে যুক্তি আছে বলেই মনে হয়। যে কোনো প্রতিষ্ঠানই ব্যাংকিং করার জন্য লাইসেন্স চাইতে পারে, তবে সেটা ট্যাক্সমুক্ত ব্যবসার জন্য হতে পারে না। কোন ব্যাংকিং ট্যাক্স ফ্রি থাকলো, অন্য ব্যাংকিং ট্যাক্সের আওতায় আসলো, এ দুধরনের ব্যবসা একই সমতলের ব্যবসা হলো না।

লেখক ঃ অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সৌজন্যঃ দৈনিক প্রথম আলো

www.pathagar.com

এনজিওগুলো কোন্ দিকে যাচ্ছে

রণজিত দাস

ইস্ট-ইন্ডিয়ার কথা আমরা কমবেশি সবাই জানি। ভারতবর্ষে তারা এসেছিলেন বাণিজ্যিক মিশন নিয়ে। বাণিজ্য ছিল তাদের বাহ্যিক আবরণ। আসল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। এই সত্যটি উপলব্ধিতে আনতে অনেক বাস্ত ব অভিজ্ঞতা আর সময় ব্যয় করতে হয়েছে। প্রথমেই কোন ভারতীয় বুঝতে পারেনি ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রাষ্ট্র দখলের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে। যখন ভারতবর্ষ ছিনতাই হয়ে যায় তখন বুঝতে আর কারো বাকি থাকলো না ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী আসলে বাণিজ্য মিশন নয় কৌশলগত ভারতবর্ষ শাসন-শোষণ করার সাম্রাজ্যবাদীদের একটি হাতিয়ার। ইস্ট-ইন্ডিয়ার এই অশুভ ফলাফলের দুঃশাসন প্রায় দু'শ বছর ভোগ করতে হয়েছে। আজকে আধুনিক বিশ্বে দেশে দেশে বড়দের আধিপত্য বিস্তার, অধীনস্থ রাখা আগের মত কৌশল অবলম্বন করে সম্ভব নয়। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন দেশকে সরাসরি শাসন করা সম্ভব নয়। এখন কৌশল পরিবর্তিত হয়েছে। এখন বিভিন্ন উপায়ে সরকার নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিকভাবে নিজেদের প্রভাব বলয়ে রাখা, অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল করে রাখার জন্য গরীব দেশগুলোতে উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন পদ্ধতি, সংস্থা কাজ করছে। বিশেষ করে কতিপয় গরীব দেশে উন্নয়নের বিকল্প মডেল হিসেবে প্রথম দিকে সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলো কাজ করতো। পুরোপুরি বিদেশী অর্থনাকূল্যে পরিচালিত হতো এসব এনজিও। স্বাধীনতার পরপরই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নাম নিয়ে এনজিওগুলো বাংলাদেশে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ শুরু করে। অনেকটা ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যেভাবে প্রবেশ করে তেমনি করে এনজিওগুলো বাংলাদেশে প্রবেশ করে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনজিওগুলো প্রথমে যে চরিত্র নিয়ে কাজ করতো সময়ের ব্যবধানে তারা আগের চরিত্র পাল্টিয়ে ফেলে। সরকারের বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এনজিওগুলো এখন তৎপর। এদের অধিকাংশ এখন রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে কর্ম পরিধি বাড়াচ্ছে। কেউ কেউ নিজেদের জন্য তৈরি নীতিমালা ভঙ্গ কর এমন সব কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে যা রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বিদেশী অর্থে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে এদের আনুগত্য থাকে দাতাদের কাছে। ক্রমাগত দুর্নীতি, অনিয়ম এনজিওগুলোতে ছেয়ে যাচ্ছে। সেবার নামে কোন কোন এনজিও ব্যবসা পেতে

www.pathagar.com

বসেছে। এনজিওর কোন কর্মকর্তা চোরাচালানের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ এনজিও তাদের কর্মপরিধিতে রাজনৈতিক ভাষা ব্যবহার করছে। স্থানীয় নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করছে কেউ কেউ। নিজের প্রতিনিধি দাঁড় করিয়ে দিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনী প্রচারণায় যুক্ত হচ্ছে কোন কোন এনজিও। নিজেদের প্রতিনিধির জন্য অর্থ ব্যয়ও করা হচ্ছে। বেশ কিছু এনজিও সেবার নাম করে ধর্মান্তরিতের কাজ করে যাচ্ছে নিয়মিত। অনেক এনজিও আছে যারা চিকিৎসার নামে এমন সব ওষধ ব্যবহার করছে যা পুরোটাই 'পরীক্ষামূলক'। বিদেশীদের হয়ে তারা এদেশের গরীব মানুষের শরীরকে 'গিনিপিগ' হিসেবে ব্যবহার করছে।

যেভাবে এনজিও'র প্রবেশ

ষাটের দশকে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান জনসেবামূলক কাজ করলেও এনজিও জাতীয় কিছু ছিল না। সে সময় জনকল্যাণকামী বহু প্রতিষ্ঠান এদেশে কাজ করতো। ১৯৭০ -এর ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ও ১৯৭১ -এর স্বাধীনতাযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন ও জনগণকে সাহায্য সহযোগিতা ও সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে এনজিও'র আগমন এদেশে ঘটে সে সময় এনজিও'র সংখ্যাও সীমিত ছিল। চোখে পড়ার মত কোন কর্মসূচী তাদের ছিল না। ক্রমাগত তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এ সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে তাদের পুনর্বাসন কমূসূচীর পাশাপাশি তারা দরিদ্র পরিবারকে আত্মনির্ভরশীলতার কর্মসূচী শুরু করে।

সরকারী পর্যায়ে সীমাহীন দুর্নীতিতে বিদেশী দাতা সংস্থাও ক্রমাগত এনজিওগুলোর প্রতি সাহায্য দানে আগ্রহী হয়ে উঠে। বিদেশী অর্থ উৎসের কারণে এনজিওদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হতে থাকে সেই সাথে বাড়তে থাকে এনজিও'র সংখ্যা। এখন দেশে এনজিও'র সংখ্যা কত তা বলা বেশ কষ্টকর। এমন এনজিও আছে যা কেবল একটি থানার নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক। কেউ কেউ আবার জেলাভিত্তিক। অঞ্চল ভিত্তিক এনজিও'র সংখ্যাও কম নয়। সংখ্যা বৃদ্ধি ও কর্মপদ্ধতি বৃদ্ধির কারণে এনজিও'র মধ্যেও এসেছে মৌলিক পরিবর্তন। দেশী এনজিও'র পাশাপাশি আগমন ঘটে বিদেশী এনজিও'র। বর্তমানে ৬শ' এনজিও বিদেশী সাহায্য পাওয়ার রেজিস্ট্রেশনভুক্ত রয়েছে। (Foreign Donation Registration-FDR)। এছাড়া নামে-বেনামে প্রায় ৫/৬ হাজার সংস্থা এনজিও'র হয়ে কাজ কছে বা সরাসরি এনজিও নাম নিয়ে কাজ করছে। এদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা বড় বড় এনজিওগুলোর 'সাবকন্ট্রাক' নিয়ে কাজ করে। এদের কেউ কেউ সমাজকল্যাণ বিভাগের রেজিস্ট্রেশনভুক্ত। প্রায় ১৬শ'র মত

www.pathagar.com

ছোট-বড় এনজিও রয়েছে যারা মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। ছোট একটি দেশ ১৬শ'টি এনজিও কাজ করছে ভাবতেও অবাক লাগে। হিসাবে কষলে দেখা যাবে প্রতি থানায় প্রায় ৪টি করে এনজিও কাজ করছে। আর সবাই কাজ করছে দরিদ্র পরিবারগুলোকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য অথচ প্রকৃত পরিসংখ্যান বলছে প্রতি বছর শতকরা দুই ভাগ মানুষ দরিদ্র থেকে চরম দরিদ্রসীমায় নেমে যাচ্ছে। খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন তাহলে এনজিওগুলো কি কাজ করছে গ্রাম এলাকায়। শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে তারপর মানুষ চরম দরিদ্র সীমায় নেমে যাচ্ছে। তাহলে এনজিও'রা যে আত্মনির্ভরশীলতার কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে তার প্রকৃত ফলাফল তো দরিদ্র জনসাধারণের কোনই কাজে আসছে না। কেন এই অবস্থা- সে বিষয়ে পরে আলোচনা করা হচ্ছে। বস্তুত এনজিওগুলো শোষণ মুক্তির শ্লোগানে মুখরিত করে গ্রামাঞ্চলে কাজ করছে অথচ এই এনজিওদের শোষণে দরিদ্র মানুষের নাভিশ্বাস উঠার জোগাড়। সে প্রমাণও পরে দেয়া হচ্ছে।

এনজিও'র ওপর সরকারী বিধিমালা

সরকারী বিধিমালা অনুযায়ী জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জননিরাপত্তা বিঘ্ন ঘটে এমন কোন কাজে এনজিও'রা জড়িত থাকতে পারবে না। বিদেশী অর্থ পরিচালিত কোন এনজিও রাজনৈতিক কোন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না, মানুষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনার পরিপন্থী কোন কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯৬০-৬১ সালে প্রনীত আইন-কানুনে বিদেশী সাহায্য গ্রহণে কোন শর্ত উল্লেখ ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতার পর অপরিমিত বিদেশী সাহায্য এসব এনজিওগুলো গ্রহণ করতে থাকে। ফলে বাধা-নিষেধ আরোপ জরুরী হয়ে পড়ে। সরকার ১৯৭৮ সালে এসে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ ও ব্যবহারের জন্যে 'দি ফরেন ডোনেশন (ভলেন্টারী এক্টিভিটিজ) রেজুলেশন রুলস ১৯৭৮ নামে নতুন আইন প্রণয়ন করে। পরে ১৯৮২ সালে এসে আরো একটি আইন প্রণয়ন করা হয় 'দি ফরেন কন্টিবিউশন রেজুলেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৮২'। এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়।

এই সব ***আইনের অন্যতম শর্তগুলো হচ্ছে-***

(ক) সরকারী অনুমোদন ছাড়া বিদেশী অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

(খ) সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রকল্প ছাড়া এনজিওগুলো তাদের অর্থ অন্য কোন প্রকল্পে ব্যয় করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে এনজিওগুলো তাদের প্রকল্প প্রণয়ন করবে এবং সরকারের এনজিও ব্যুরো কর্তৃক তার অনুমোদন নিতে হবে।

www.pathagar.com

(গ) সরকারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন ছাড়া কোন এনজিও তাদের সংস্থায় কোন বিদেশীকে নিয়োগ করতে পারবে না।
(ঘ) সরকারের কাছে এনজিওসমূহ তাদের কার্যক্রমের নিয়মিত প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। এই প্রতিবেদন পেশ করতে হয় এনজিও ব্যুরোর কাছে।
(ঙ) এনজিওসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব সরকারের নিকট পেশ করতে হয়।

এনজিওগুলো রাজনৈতিক ভূমিকায়

কোন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এনজিওদের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। সুতরাং আইন অনুযায়ী এনজিওরা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু প্রায় বড় বড় এনজিওগুলো রাজনৈতিক কর্মকান্ডে কখন প্রকাশ্যে আবার কখন পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে। প্রশিকা, নিজেরা করি, গণসাহায্য সংস্থা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এসব এনজিও সরাসরি বামপন্থী মতবাদ প্রচার করে যদিও এদরে অর্থ আসে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশগুলো থেকে। চাকরি দেবার ক্ষেত্রে এসব এনজিও বামপন্থী নেতা-কর্মীদেরকে বেশী পছন্দ করে থাকে। নিয়োগের সময় রাজনৈতিক পরিচয় জেনেই নিয়োগ দেয়া হয়। এদের মাঠকর্মীরা মার্কস-লেনিন-মাও সেতুং প্রভৃতি বরেণ্য রাজনীতিকদের বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব টার্গেট গ্রুপকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এরা জনগণকে বামপন্থী দলগুলোর মত সমাজ কাঠামো ভাঙ্গা, বিপ্লবের কথা বলে থাকে যদিও তারা প্রকৃতভাবে সেই রাজনীতি ধারণ করে না। এদের বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বামপন্থীদের ন্যায় 'রেড সেলুট' পরস্পরকে দেয়। বক্তব্যের শুরুতে মার্ক্স-লেনিনের নাম নেয়, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক', স্লোগান দেয়। বস্তুত এদের পুরো পরিভাষা বামপন্থী রাজনীতির অনুরূপ। এতো গেলো একটি দিক। রাজনীতির আরো অনেক দিকে এনজিওগুলোর পদচারণা রয়েছে। স্থানীয় নেতৃত্বকে হাত করার জন্য কোন কোন এনজিও বিশেষভাবে অর্থ ব্যয় করে থাকে। যা এক ধরণের দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে। স্থানীয় সমস্যা নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ঘেরাও, অবরোধ করার কাজে এনজিওগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। এই বিক্ষোভ সংগঠিত করার জন্য অনেকেই অর্থ ব্যয় করে থাকে। এই তো সেদিন ঢাকার প্রেস ক্লাবের সামনে একটি রাজনৈতিক সংগঠন 'কৃষাণী সভার' বিক্ষোভ সমাবেশের জন্য বরিশাল থেকে কৃষক-কৃষাণী আনা-নেওয়া, থাকা খাওয়ার যাবতীয় ব্যয় করেছে একটি এনজিও যদিও ঐ সমাবেশটি ছিল একটি সরকার বিরোধী সমাবেশ। প্রায় লক্ষাধিক টাকা ঐ সমাবেশের পিছনে এনজিওটি খরচ করেছে। একই এনজিও গার্মেন্টেসে দাবি-দাওয়া আদায় ও বিক্ষোভ সমাবেশের জন্য নেপথ্য ভূমিকা কাজ করে। ক'দিন আগে সিটি কর্পোরেশনের সুইপার ধর্মঘটের পিছনে একটি এনজিও

www.pathagar.com

সরাসরি কাজ করেছে। এনজিও'র কর্মকর্তারা রাতদিন সুইপার কলোনীগুলোতে অবস্থান করে ধর্মঘটের পক্ষে কাজ করে। এ রকম আরো বেশ কিছু এনজিও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সরাসরি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। এই নিয়ে এনজিওদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি আসে। ব্রাকের ফজলে হোসেন আবেদের নেতৃত্বাধীন অংশ সরাসরি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করে অন্যদিকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জাফরুল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন অংশ এরশাদ পক্ষ অবলম্বন করে। পরবর্তীতে এই দ্বন্দ্বের ফলে 'এডাব' (এনজিও সমন্বয়কারী সংস্থা) -এর প্রধানের পদ থেকে জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে সরিয়ে দেয়া হয়। অথচ এই এনজিওরা ১৯৮৮ সালে বন্যাত্তোর সময়ে এরশাদকে ওসমানী মিলনায়তনে বিপুল সম্বর্ধনা দেয়। এর দু'টো ঘটনাই ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক। যদিও আইনগতভাবে এনজিওদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ। অধ্যাপক গোলাম আযমের তথাকথিত বিচার প্রশ্নে বড় বড় ১১টি এনজিও সরাসরি গণআদালত (?) উদ্যোক্তাদের পক্ষে দাঁড়ায়। পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে তারা অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচার দাবি করে। এনজিওগুলো সিদ্ধান্ত নেয় তারা স্ব স্ব সংস্থার ব্যানারে মিছিল সহকারে ২৬ মার্চের গণআদালত (?) অনুষ্ঠানে হাজির হবেন। এই ঘটনা সরকারের কানে এলে এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর এক বৈঠক হয়। সরকারের পক্ষ থেকে এনজিওদেরকে এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ না করা এবং ইতিপূর্বে অধ্যাপক গোলাম আযমের বিচার চেয়ে যে বিবৃতি দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে। এনজিওগুলো বিবৃতি প্রত্যাহার না করে এবং শোভাযাত্রা করে গণআদালত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে।

বেশ কিছু এনজিওর নিজস্ব প্রকাশনা আছে। প্রকাশনা বের করা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ নয়। তবে রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে যে কোন প্রকাশনা এনজিওর জন্য নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা কেউ কেউ তোয়াক্কা না করে রাজনৈতিক পত্রিকা বের করে। এডাব 'অধুনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করে যাতে বেশি কিছু রাজনৈতিক বক্তব্য থাকে। রাজনৈতিক দল ও সরকারের সমালোচনায় মুখর থাকে এডাবের এই 'অধুনা' পত্রিকাটি। এইভাবে একেকটি এনজিও এককভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এনজিওদের সরাসরি ছাত্র সংগঠনও আছে। এছাড়া অনেক ডান-বাম ছাত্র সংগঠনকে মোটা অংকের চাঁদা দিয়ে নিজেদের পক্ষে রাখে। এইভাবে তারা কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনকে মোটা অংকের অর্থ দিয়ে থাকে। এছাড়া মূল রাজনৈতিক দলগুলোকে বিভিন্ন সময় মোটা অংকের চাঁদা দিয়ে নিজেদের প্রভাবাধীন রাখে। এনজিওদের এই কাজও আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। এনজিওগুলোর সমন্বয়ের জন্য এডাব কাজ করে। কিন্তু

www.pathagar.com

সাম্প্রতিককালে নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা থেকে আরো একটি সমন্বয়কারী সংস্থা 'এনজিও কোয়ালিশন ফর দি আরবান পুরোর' গড়ে তুলেছে। এডাব থাকার পরও কতিপয় বড় এনজিও মিলিতভাবে আরও একটি সমন্বয়কারী সংস্থা কেন গড়ে তোলা হলো ? মানব সেবার নাম করে এনজিও অধিক মাত্রায় দেশীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। আইনের দৃষ্টিতে যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেবাকার্য চালানোর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতি করবে তো কোন দরকার নাকি সেবার নাম করে এনজিওগুলো ভিতর ভিতর রাষ্ট্র ক্ষমতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

বিদেশী অর্থের অনুমোদন নেই

বাংলাদেশ রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ৬৩৩টি এনজিও বিদেশী অর্থ সাহায্য হিসাবে পায়। সরকারের অনুমোদন ছাড়া এই অর্থ গ্রহণ ও ব্যয় করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। রাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞা অধিকাংশ এনজিও তোয়াক্কা করেনি। সম্প্রতি এনজিও ব্যুরোর এক তদন্তে ধরা পড়ে প্রায় ৫০টি বড় বড় এনজিও সরকারের অনুমোদন ছাড়াই কোটি কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য গ্রহণ ও খরচ করেছে। ১৭৮৪ কোটি বিদেশী টাকার ১০২০টি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে। এ ছাড়া প্রধান প্রধান এনজিও যারা এভাবে লাখ লাখ টাকা নিয়েছে তারা হলো- ইউসে, সপ্তাগ্রাম, নারী স্বনির্ভর, আরবান, সিএলবি, ডিয়াকোনিয়া, টিডিএইচ (ফ্রান্স), ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ (আমেরিকা), হীড বাংলাদেশ হ্যাডস, লাইফ বাংলাদেশ, আইডিএ, আইডিএস, বিএডিএস, লুথারান মিশন। প্রভাব বিস্তারকারী এনজিওগুলো কমবেশী সকলেই অনুমোদনহীন অর্থগ্রহণ করেছে এবং এমন সব প্রকল্পের খরচ করছে যার কোন সরকারী অনুমোদন নেই। এনজিওগুলো অর্থের জন্য দাতাদের পছন্দ মত প্রকল্প দাখিল করছে এবং অর্থ নিচ্ছে কিন্তু অনুমোদনহীন ঐ সব প্রকল্পগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষতিকারক কি-না তা আর জানার উপায় থাকছে না। এনজিওদের এই লুকোচুরি বিষয় মোটেও ভাল কিছু বয়ে আনবে না। ইতিমধ্যে এনজিও সম্পর্কে অনেক অভিযোগ জমা হচ্ছে। কেউ কেউ রাজনৈতিকভাবে এগুচ্ছে, কেউ কেউ সেবার নামে ধর্মান্তরিতের কাজ করে যাচ্ছে। এই অভিযোগ এনজিও ব্যুরোর তদন্ত রিপোর্টেও পাওয়া গেছে। অনিয়ম, দুর্নীতি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত ও ধর্মান্তরিতের কাজে যুক্ত হওয়ার অপরাধে এনজিও ব্যুরো বেশ কিছু এনজিওর নামে শোকজ নোটিশ জারি করে বলেছে কেন তাদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে না তার জবাব দিতে বলেছে।

www.pathagar.com

এনজিও ব্যুরো তার তদন্তের পাশাপাশি এনজিওর কাজকর্ম সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে বেশ কিছু সুপারিশও করেছে। তাতে বলা হয়েছে সরকারের প্রতি অধিক দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য নির্দিস্ট এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধির সমন্বয়ে এনজিও কর্মকান্ড তদারকি করা একটি উচ্চ পর্যায়ে কমিশন বা কমিটি গঠন যার কাছে এনজিওগুলো দায়বদ্ধ থাকবে, আইনের গতিশীলতা সৃষ্টি এবং দোষী এনজিওগুলোকে শাস্তির ব্যবস্থা করা, এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন কাঠামো নির্দিষ্ট করা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থাকরণ। এই রিপোর্ট তৈরি করার পর থেকেই দাতাদের পক্ষ থেকে সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে বলে ব্যুরোর একটা সূত্র থেকে জানা গেছে। খানে দাতাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তাতারা কেন এনজিওগুলোর দুর্নীতি, অনিয়ম আইনভঙ্গ করার বিরুদ্ধে সরকারের করণীয় বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করতে যায়। তাহলে কি দাতাদের পরামর্শ অনুযায়ী এনজিওগুলো তাদের বর্তমান কাজ চালাচ্ছে ? দাতাদের আচারণে তাই প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহলে দাতারা কি এনজিওগুলোকে কি ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভূমিকায় দেখতে চায় ? এই প্রশ্নের সমাধানে সরকারকে ভূমিকা নিতে হবে।

কয়েকটি এনজিও ও শ্রম শোষণ

দীর্ঘ ৯ বছরের এরশাদীয় স্বেরাচারী শাসনের সুযোগে এনজিওগুলো বেপরোয়া হয়ে যায়। সরকারী নিয়ন্ত্রণ না মেনেই অনেক ক্ষেত্রে কাজ চালিয়েছে। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দাতাদের কাছে দায়বদ্ধতা থাকার কারণে অনিয়ম, দুর্নীতি হয়েছে অনেক। অনেক এনজিও কর্মকর্তা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বেতন ভাতা ইত্যাদির নামে লাখ লাখ টাকা তুলে নিয়েছেন। এসব এনজিও নির্বাহী প্রধানদের বেতন ভাতা আকাশ ছোঁয়া। কারো কারো মাসিক বেতন ২৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা একত্রে তার খরচ লাখের ঘরে পৌঁছে। শুধু তাই নয়, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সংস্থা চাকুরী নাম করে বেতন তুলছে। আত্মীয়-স্বজনও বাদ যায় না। অর্থের নয় ছয় প্রায় কমবেশী সব এনজিওর আছে। যেহেতু তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিজেরা ছাড়া অন্যরা কেউ করে না তাই তাদের অর্থনৈতিক অনিয়ম জনসমক্ষে আসে না। এছাড়া যাদের অর্থনৈতিক অনিয়ম চিটেফোটা পত্র-পত্রিকায় এসেছে এদের মধ্যে নিজেরা করি, কারিতাস, সেবা, প্রশিকা মানবিক, ব্রাক, গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা, সপ্তগ্রাম, নারী স্বনির্ভর, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, গণ সাহায্য সংস্থা। এদের মধ্যে কারো কারো নামে জোর করে ভূমি দখল, প্রতারনার অভিযোগ আছে। এসব এনজিওগুলোর প্রধান কর্মকর্তারা মোটা অংকের বেতন ভাতা পেলেও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা বেতন পায় নাম মাত্র।

www.pathagar.com

এনজিওগুলো ঘটা করে মে দিবস পালন করে অথচ নিজিদের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা কাজের কোন সময় সীমা নেই। ব্রাকের একজন মাঠ কর্মীকে সকাল ৮টা থেকে রাত ১২/১টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে কাজ করতে হয়। সমপরিমাণ কাজ করতে হয় প্রশিকা, গণসাহায্য সংস্থা, গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, নিজেরা করি প্রভৃতি এজিওতে কর্মরত মাঠ কর্মীদের। এদের বেতন কাঠামো আশ্চার্য রকম। একজন মাস্টার ডিগ্রী পাস মাঠ কর্মীকে ব্রাক বছর তিনেক আগে মাসিক বেতন দিতো ৩৭৫০ টাকা এখন বেতন দেয় ২৫শ' থেকে ৩১শ'। বেতন অন্যান্য সংস্থাগুলোতে বাড়লেও এনজিওগুলোতে কমেছে। ব্রাকের মাঠ কর্মীরা প্রতিদিন ৮ ঘন্টার পরিবর্তে ১৬ ঘন্টা পরিশ্রম করে। আন্তর্জাতিক শ্রম আইন অনুযায়ী বাড়তি শ্রমের ওভার টাইম দেয়ার কথা বস্তুতঃ তা দেয়া হয় না। নিজেরা করি একজন মাস্টার ডিগ্রী পাস মাঠ কর্মীকে বেতন দেয় আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা। গণস্বাস্থ্য সংস্থা বেতন দেয় ১৮শ' থেকে ৩ হাজার টাকা বেতন দেয় ২২৫০ টাকা। অনেকটা গার্মেন্টস শ্রমিকের মত। এরপর রয়েছে মানসিক নির্যাতন। ঊর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তির অমানবিক আচরণে অনেক মাঠকর্মী ২/৩ মাসের বেশী চাকুরী করতে পারে না। শুধু তাই নয়, কোন কোন এনজিও প্রাইমারী বা গণ স্কুল পরিচালনা করলেও তাদের শিক্ষকদের বেতন দেন মাত্র ৪শ' থেকে ৫শ' টাকা। ব্রাক তার কর্মীদের সাথে করে সবচেয়ে নিষ্ঠুর আচরণ। কর্মীর প্রয়োজনে সাধারণত কোন ছুটি দেয়া হয় না। শুধু তাই নয় সাপ্তাহিক ছুটির দিনও কাজ করতে হয় কখনও কখনও। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে দৈহিক নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। এতো গেলো একটি দিক। অনেক এনজিওর আছে নিজস্ব ব্যবস প্রতিষ্ঠান। ব্রাকের আড়ং, প্রকাশনা, প্রশিকা, মানবিকের আছে 'দ্রুতি' নামে পরিবহণ ব্যবসা, ছাপাখানা, গার্মেন্টস, ভিডিও লাইব্রেরী। ব্রাকের সহযোগী এনজিও আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশনের আছে হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান যার উৎপাদিত সামগ্রী আড়ং-এ বিক্রি হয়। গার্মেন্টেসের মতো এখানেও চলে অমানবিক শোষণ। একজন অদক্ষ নারী শ্রমিক প্রতিদিন ৮ ঘন্টা পরিশ্রম কর পায় মাত্র ১০ টাকা বা মাসে ৩০০ টাকা। দক্ষ শ্রমিক পায় ৭/৮শ' টাকা প্রতিমাসে। অথচ এই শোষিত নারী শ্রমিকের উৎপাদিত সামগ্রী 'আড়ং' -এ গলাকাটা দামে বিক্রি করা হয়। মাঠ কর্মীদের অমানবিকভাবে শ্রম শোষণ করা হলেও প্রশাসনিক ব্যয় কিন্তু কোন এনজিওর কম নয়। নিয়ম অনুযায়ী কোন এনজিও মোট বরাদ্দের ২০ ভাগের বেশি প্রশাসনিক ব্যয় করতে পারে না। বাস্তবে হয় তার উল্টো। কোন এনজিওরই প্রশাসনিক ব্যয় ৫০ ভাগের কম নয়। যেমন নিজেরা করি বেতন ভাতা খাতে ব্যয় করে ৫৭ ভাগ, বাড়ি ভাড়া, যানবাহন, নির্মাণ খাতে ব্যয় করে

www.pathagar.com

৩০ ভাগ। প্রশিকা মানবিক তার প্রকল্প বরাদ্দের ৩০ ভাগ বেতন ভাতায় ব্যয় করে। এনজিও ব্যুরোর তদন্তে দেখা গেছে এনজিওগুলো তাদের হাতে আসা বিদেশী অর্থের ৬০ ভাগ ব্যয় করে প্রশাসনিক খাতে। ২০ থেকে ৪০ ভাগ ব্যয় করা হয়েছে কর্মসূচী বাস্তবায়ন খাতে। সব এনজিও'র কেন্দ্রীয় অফিসে রয়েছে একাধিক নামী-দামী বিলাস বহুল গাড়ী। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে একদিকে বিপুল পরিমাণ প্রশাসনিক ব্যয় করার হিসাব দেখানো হচ্ছে অন্যদিকে মাঠ কর্মীদেরকে নূন্যতম বেতন ভাতা দেয়া হচ্ছে। তাহলে খুব স্বভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যাচ্ছে কোথায়? সহজ উত্তর আত্মসাৎ করা হচ্ছে। আবার কম বেশি প্রত্যেকেরই বিভিন্ন প্রকার লাভজনক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। স্বেচ্ছাসেবী কোন প্রতিষ্ঠান লাভজনক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে কি তাও ভেবে দেখা দরকার।

ঋণদান ও ভিতরের খবর

কম বেশী সব এনজিওরই ঋণ দান কর্মসূচী রয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক ঋণদানের ক্ষেত্রে বড় এনজিও। এছাড়া ব্রাক, প্রশিকা, গণ সাহায্য সংস্থাসহ আরো বহু এনজিও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিভিন্ন নামে ঋণ দিয়ে থাকে। এখানে ঋণ আদায় পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে বড় রকমের শোষণ। এনজিওদের ঋণে 'সুদ' বলে কোন শব্দ ব্যবহার করা হয় না। এখানে সুদকে সার্ভিস চার্জ নামে ডাকা হয়। একেক এনজিও'র সার্ভিস চার্জ একেক রকম। কারও শতকরা ১২ কারও ১৪ আবার কারও ১৫ ভাগ। নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের সুদাসলসহ হিসাব করে সারা বছরের সময়কে কয়েক কিস্তিতে ভাগ করা হয়। প্রতি কিস্তিতে ঋণগ্রহীতা নির্দিষ্ট টাকা পরিশোধ করবে। ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে অনিবার্য নির্যাতন। গ্রামীণ ব্যাংক কর্তৃক পরনের কাপড় খুলে নেয়ার খবরও পত্রিকায় এসেছে। এই সার্ভিস চার্জ বছর শেষে শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগে পৌঁছে যায়। যা কিনা মহাজনী ব্যবসা বলা যায়। একটু হিসাব দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক কোন এনজিও এক কোটি টাকার ঋণ বিতরণ বরলো। সুদাসলসহ হলো এক কোটি ১২ লাখ টাকা। ১৩ কিস্তিতে ভাগ করা হলো। প্রতিমাসে কৃষক এই ঋণ শোধ করবে। দেখা গেলো প্রথম মাসে সুদাসলসহ আদায় হলো ১০ লাখ টাকা। যার মধ্যে ৯১ লাখ টাকা ছিল আসল। বস্তুত ৯১ লাখ টাকা এক মাসের মধ্যে এনজিওর হাতে আসলেও সুদ দিতে হলো এক বছরের। কারণ ঐ ৯ লাখ টাকার সুদ ১ বছর পর পাওয়ার কথা। এইভাবে দেখা যায় প্রথম ৬ মাসে অর্ধেক টাকা সুদাসলসহ ফিরিয়ে আসে। কৃষক ৬ মাস টাকা খাটালেও সুদ দিতে হয় এক বছরের। শুধু তাই নয়, কোন কোন এনজিও মোট ঋণের ১০ ভাগ টাকা আগেই

www.pathagar.com

কেটে রেখে দেয়। যার সুদ ঐ কৃষককে দিতে হয়। এভাবে দেখা যায় বছর শেষে কৃষক ২৫ থেকে ৩০ ভাগ সুদ দেয়। ঋণ ব্যবসা এনজিওদের এক জমজমাট ব্যবসা। অথচ কৃষককে স্বনির্ভরতা সৃষ্টির নামেই এই শোষণ করা হচ্ছে।

শেষ কথা

কার্যত দেশের সেবার কথা বলে এনজিওগুলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা কোন কোন ক্ষেত্রে এতোই বেপরোয়া যে রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুনও মানতে রাজী নয়। এই সত্যটি ধরা পড়েছে এনজিও ব্যুরোর এক তদন্তে। তদন্তে ধরা পড়েছে এরা রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। অনুমোদনহীনভাবে অর্থ গ্রহণ ও ব্যয় করছে। বেশ কিছু এনজিও ধর্মান্তরিতের কাজে লিপ্ত রয়েছে। কারো কারো দুর্নীত এতেই ব্যাপক যে সরকার তাদের কর্মকান্ড বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল। ইতিমধ্যে এনজিও ব্যুরোর রিপোর্ট নিয়ে উচ্চ পর্যায়ে নাড়া পড়ে যায়। আমেরিকা, সুইডেন রাষ্ট্রদূতরা ব্যুরোর রিপোর্টের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানায়, যেন এনজিওর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়। এদিকে এনজিও প্রধানগণ আমলা, মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্রনেতাদের সাথে জোর লবিং চালিয়ে ব্যুরোর রিপোর্টকে অকার্যকর করার চেষ্টায় আছে বলে জানা গেছে।

কিন্তু এনজিও ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯ আগস্ট দপ্তর থেকে ব্যুরোর মাধ্যমে এডাব ও সেবার রেজিস্ট্রেশন বাতিল ও সম্পত্তি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করা হয়। একইভাবে আরডিআরএস-এর নির্বাহী পরিচালক পিটারসনকে সন্দেহজনক আচরণের ১ বছরের মধ্যে দেশ ত্যাগের কথা বলা হয়। কিন্তু সেদিনই আবার এডাবকে দেয়া শাস্তি তুলে নেয়া হয়।। ধারণা করা হচ্ছে দাতাদের চাপেই সরকার তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। এনজিও এক ধরণের ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। যার জন্যে ব্যাঙের ছাতার মত সারাদেশে এজিও গড়ে উঠেছে। কেউ কেউ শুধুমাত্র থানাভিত্তিক এনজিও গড়ে তুলেছে। কেউ কেউ রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাওয়ার জন্যে স্বউদ্যোগে এনজিও চালু করে এখন ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকায় গাড়ি-বাড়ি করছে। এ কারণে এখন এনজিও খোলার হিড়িক পড়ে যায়। সাবেক বামপন্থী নেতা কর্মীরা এদিক থেকে এগিয়ে রয়েছে। এছাড়া আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি, শিক্ষক, সাবেক বড় বড় আমলা, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অনেক শিক্ষক আছেন যারা শিক্ষকতার পাশাপাশি নামে-বেনামে এনজিও খুলেছে বা এনজিওর বড় বড় কর্মকর্তা হয়েছে। আবার কেউ

www.pathagar.com

কেউ কনসালটেন্সি নিয়ে মোটা বেতন তুলছেন। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অনেক ব্যক্তিরা 'পার্ট টাইমে' এনজিওতে কাজ করে মোটা বেতন পাচ্ছে। দেখা গেছে, মূল চাকরির চেয়ে এনজিওতে এরা বেশি সময় দেয়। তারা এভাবে এনজিওতে কাজ করতে পারে কি-না বা কোন এনজিও পরিচালনা করতে পারে কি-না সে বিষয়টি এখন বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। '৭০-এর দশকে এনজিওগুলো সেবামূলক কাজের কথা বলেই তাদের কর্মকান্ড শুরু করেছিল। ২০/৩০ বছর পর এসে এনজিওগুলো পূর্বের 'কমিটমেন্ট' থেকে সরে এসে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি কাম্য নয়। জনগণের কল্যাণের কথা যারা বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করেছেন তাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে এই অর্থ এদেশের মানুষের দরিদ্রতাকে পুঁজি করেই আনা হচ্ছে। সুতরাং দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণে তা ব্যয় করতে হবে। দিনে দিনে এনজিওর মধ্যে যে শোষণ, নির্যাতন, দুর্নীতির আশংকা গড়ে উঠেছে তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। সরকারী নিয়ম-কানুন মেনেই দেশের কাজ করতে হবে। আর যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এগুচ্ছে তাদেরকে এনজিও বাদ দিয়ে সরাসরি রাজনৈতিক দল নিয়ে মাঠে নামাই শ্রেয়। রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত এনজিওদের বিরুদ্ধে কঠোর সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। কারণ দেশের স্বার্থেই তা প্রয়োজন। সরকারী দুর্বলতা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতি বয়ে আনবে। দরিদ্রতাকে পুঁজি করে যে কোন ফায়দা লুটার বিরুদ্ধে সরকারকে হতে হবে কঠোর। কারণ কেউ যেন নতুন করে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী হওয়ার স্বপ্ন না দেখে।

লেখক ঃ গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।
সৌজন্য ঃ সাপ্তাহিক খবরের কাগজ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে এনজিও অপতৎপরতা

প্রফেসর (ড.) মোহাম্মদ আবদুর রব

এনজিওদের বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ করে নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ এখন আর কোন নতুন বিষয় নয়। ইদানিংকালের সকল জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনেই অপতৎপরতাবাদী এনজিও অপশক্তিগুলো তাদের লোকবল, অর্থবল, প্রচারমাধ্যম এবং অন্যান্য সকল উপায়-উপকরণ নিয়ে প্রকাশ্যে এবং গোপনে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির উত্থানে শঙ্কিত হয়ে বড় প্রতিবেশী আগ্রাসী ভারত এবং সমুদ্রপারের ইহুদী ও খ্রীষ্টবাদী শক্তিগুলো দারুণভাবে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এবং তারা ঐ নির্বাচনে দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী শক্তির বিজয়কে 'মৌলবাদী' তথা ইসলামী শক্তির বিজয় হিসাবে ধরে নিয়ে প্রচার-প্রপাগান্ডা শুরু করে। বাংলাদেশে ঐ সব দেশের হাইকমিশন ও দূতাবাস তাদের বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থার ছদ্মাবরণে শুরু করে নীতি-নির্ধারনী পরামর্শ (!) সভা ও বৈঠকের; এবং তারা সিদ্ধান্ত নেয়– পরবর্তী নির্বাচনে যে কোন প্রকারে দেশের ঐ জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী ঐক্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে হবে একটি জাতীয়তাবাদবিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং আজ্ঞাবাহী দলকে। আর এক্ষেত্রে তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণের সহযোগী শক্তি হিসাবে বেছে নেয় তাদের অর্থমদদপুষ্ট নানা রঙের ও নামের এনজিওসহ নির্বাচন পর্যবেক্ষকের ছদ্মাবরণে অপতৎপরতাকামী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও গোষ্ঠীকে। এরই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই, '৯৬ -এর নির্বাচনে অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং সুচিন্তিত চক্রান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন এনজিওগোষ্ঠী আওয়ামী লীগ নামের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠীকে বাংলাদেশের ক্ষমতায় বসানোর ক্ষেত্রে দারুণ ভুমিকা পালন করে। প্রশিকা, কারিতাস, ব্র্যাক, ফেমা, সমাজকল্যাণ সংস্থা, আশা, নারীপক্ষ , নিজেরা করি সহ আরো অসংখ্য এনজিও বিগত নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং এদের কোন কোনটির নির্বাচনী অপতৎপরতা সরাসরি জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী দল সমূহের পরাজয়ের পিছনে বিপুলভাবে ভুমিকা রাখে বলে এখন প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিভাত।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সম্ভবতঃ বাংলাদেশেই এনজিও কার্যক্রম সবচেয়ে বেশী এবং সাম্প্রতিক কালে এদের তৎপরতা ও প্রসার অতিদ্রুত বিস্তার লাভ করছে। স্বাধীনতার পর এসব দেশী ও বিদেশী এনজিওসমূহ যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের

www.pathagar.com

পূণর্গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাহায্য সহযোগীতা নিয়ে কাজ শুরু করে। উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করলেও অচিরেই তাদের বেশীর অংশই ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে বিলাসবহুল এবং ভোগবিলাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। বাংলাদেশে এনজিওদের কাজের তদারক ও তৎপরতা নিয়ন্ত্রনে জন্যে সরকার 'এনজিও ব্যুরো' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলে। এবং তাদের প্রনীত নীতিমালায় কাজের পরিধি, জবাবদিহিতা, তহবিল সংগ্রহ ও খরচের খাত ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা/নীতি-নিধারণী ঘোষণা করে। এসব ধারায় সুস্পষ্টভাবে বিধৃত রয়েছে যে, বাংলাদেশের দেশী-বিদেশী কোন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও কোন ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ নিতে পারবে না; তারা শুধুমাত্র সমাজকল্যাণ, জনসেবা, ত্রাণতৎপরতা, পূনর্বাসন, দান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, মানব উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। তাদের অন্যান্য সামাজিক কাজের মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, শিশু ও মাতৃকল্যাণ, দারিদ্রবিদূরণ, ক্ষুদ্র ঋণদান , মানবাধিকার সংরক্ষণ, লিঙ্গ ও বর্ণভেদ সমস্যা রোধে সচেতনতা সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সমাজের নির্যাতিত ও মহিলাসমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক ও মানবাধিকার সচেতনতা সৃষ্টিই প্রধান। কোনক্রমেই এসব উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়া, দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদ-বিশংবাদ কিংবা কোন ধরনের রাষ্ট্র ও জাতির জন্য ক্ষতিকর অপতৎপরতায় লিপ্ত হবার অনুমতি বা সুযোগ দেয়া হয়নি। এনজিও ব্যুরো তাদের নীতিমালার বিভিন্ন ধারায় সুস্পষ্টভাবে এনজিও গুলোর কাজের আওতা, তহবিল, বিলিবন্টনের খাত সমূহ এবং জবাবদিহিতার কথা লিপিবদ্ধ করেছে। এসব এনজিওগুলো ইদানিং নিজেদেরকে সুশীল সমাজের দাবিদার হিসাবে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তাদের এমন দাবি সত্বেও তাদের অনেক কর্মকান্ডেই দেশের সচেতন সমাজ ক্রমাগত উদ্দিগ্ন ও প্রশ্নমুখর হয়ে উঠছেন। বাংলাদেশের এনজিওগুলোকে দেশের আইনে অবশ্যই হতে হবে এক একটি অলাভজনক (Non-Profit) ও অরাজনৈতিক (Non-Political) সংস্থা। সরকারের 'Voluntary' Social Welfare Agencies Ordinance -1961' -এর ৪৬ নং ধারা অনুযায়ী (Voluntary Social Welfare Agencies Ordinance No XLVI of 1961) এবং 'ফরেন ডোনেশন রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৮৭ এর ৪৬ নং ধারা' ও '১৯৮২ এর ৩১ নং ধারা' (Foreign Donation Regulation Ordinance No. XLVI of 1978 and Ordinance No XXXI of 1982) -এর মাধ্যমে সকল

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক অপতৎপরতাকে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আজকাল দেশের ছোট-বড় বেশীর ভাগ এনজিওই নগ্ন ও বেপরোয়াভাবে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে তাদের অর্থ, লোকবল ও জনবলকে নিযুক্ত করছে। তাদের সবাই পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে এবং প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়িক ভাবে জড়িয়ে পড়েছে বলে পত্র-পত্রিকা ও সংবাদ উৎস থেকে জানা যায়। উদাহারণ হিসাবে বলা যায়, গ্রামীণ ব্যাংক ইতোমধ্যে দেশের প্রধানতম "কাবুলিওয়ালা ধারা"-র অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের এই সেবামূলক অর্থলগ্নীকরণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ, আদর্শিক ইসলামী ও বামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং সচেতন মহল সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এক গবেষণা প্রবন্ধে দেখা যায় যে, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, আশা, ব্র্যাক, প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর এনজিও ২০%-২২% ভাগ থেকে প্রায় ৪০%-৫০% ভাগ হারে সুদ গ্রহণ করে থাকে। এবং এদের এই সুদখোরী, মহাজনী প্রথার শিকার প্রধানতঃ দেশের অতিশয় গরীর-দুঃখী ছিন্নমূল মহিলা সমাজ এবং ভূমিহীন কৃষক। এসব এনজিও-র বিনিয়োগকৃত ক্ষুদ্র ঋণের সুদ আদায়ের নিষ্ঠুরতম পন্থা ও নিপীড়নমূলক পদ্ধতি বিগত যুগের ঘৃন্য "কাবুলি ওয়ালাদের" নিষ্ঠুরতাকেও হার মানিয়েছে। সুদি অর্থলগ্নী ব্যবসা ছাড়াও এনজিওদের অনেকেই (গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা, কারিতাস) মহাজনী ও ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে ব্র্যাকের প্রকাশনা শিল্প 'আড়ং' নামের উঁচু মুনাফা ভিত্তিক গ্রামীণ কুটির শিল্প, পোলট্রি ও ডেইরী শিল্প ইত্যাদি অন্যতম। সুদি-মহাজনী ব্যবসা ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংক শুরু করেছে টেলিফোন ব্যবসা, (গ্রামীণ ফোন), ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যবসা (গ্রামীণ চেক), কম্পিউটার ব্যবসা, গ্রামীণ বাইটেক নামের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবসা ইত্যাদি। ব্র্যাকের ব্যাংক ব্যবসার কথাও উল্লেখ করা যায়। এসব সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন খ্রীষ্টান মিশনারী সংস্থা ও অন্যান্য দাতাগোষ্ঠী (ডোনার এজেন্সি) থেকে মানবতার জন্যে যেমনঃ দারিদ্র বিমোচন, রিলিফ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশু ও মাতৃমঙ্গল খাতে অর্থ অনুদান লাভ করে থাকে। ঐসব অর্থই তারা চড়াসুদে ও লাভে বিভিন্ন ধরনের মহাজনী ও ব্যবসায় বিনিয়োগ করে কোটি কোটি টাকা আয় করছে এবং তারা নিজেদের (পরিচালক, এমডি, সভাপতি, চেয়ারম্যান, কর্মকর্তা) বিলাসবহুল বাড়ী-গাড়ী, সম্মানী-পারিতোষিক ও আমোদ-ফুর্তিতে ব্যয় করে থাকে। সচেতন সমাজে সমালোচিত যে, এনজিও খাতে বিদেশী সহযোগী সংস্থাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের শতকরা ৬০/৭০ ভাগই ঐসব অনুৎপাদনশীল ও ভোগবাদী খাতে ব্যয় হয়। খয়রাতের টাকায় এনজিওদের

www.pathagar.com

এহেন বিলাসবহুল ও আরাম-আয়েশ এবং রাজকীয় জীবন যাপনকে ব্যাঙ্গ করে বুদ্ধিজীবি সমাজে এনজিও-সমাজকে "পাজেরো কালচার" (Pajero Culture) হিসাবে আজকাল উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এক কথায়, এনজিও'রা তাদের মূল সেবামূলক কাজ ছেড়ে ভোগ, লুঠপাট, রাজনীতি এবং ক্ষমতারোহনের অপতৎপরতায় মেতে উঠেছে বলে দেখা যায়।

এনজিওদের রাজনীতিতে নাক গলানোর ঘটনা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশের সাধারণ জনগণ এনজিও'দের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ মোটেও ভাল চোখে দেখছে না। এনজিও-রাজনীতির পেছনে এনজিও- মালিক ও কর্মকর্তাদের উচ্চাবিলাসী মনোবৃত্তি ছাড়াও তাদের নেপথ্য-মদদদাতা, অর্থ-তহবিল সরবরাহকারী বহিঃশক্তিসমূহের গোপন ইঙ্গিত ও স্বার্থ জড়িত রয়েছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশের বিশেষ ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে এবং এখানে এক বিশেষ স্বকিয়তাধর্মী আদর্শিক রাজনীতির ভবিষ্যত সম্ভাব্য উত্থানের আশংখায় তাদের উত্থানকে (ইসলামী শক্তিসমূহকে) অঙ্কুরে বিনাস করার জন্য কিংবা কৌশলগত ভাবে মোকাবিলা করার জন্যে এখানকার বৃহত্তর এনজিওগুলোর জন্মদান করেছে এবং তাদেরকে (এনজিওদের) দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্যে বিকল্প শক্তি হিসাবে দাড় করানো জন্যে অর্থাৎ রাজনীতিতে অবতীর্ণ করাতে নেপথ্য থেকে কলকাঠি নাড়ছে। এনজিও-দের রাজনীতিতে নাকগলানোর সূক্ষ্মকৌশল হিসাবে বর্তমানে তারা সুশীল সমাজের অভ্যুদয় (Emergence of Civil Society), মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন ((Empowerment of Poor and Women) ইত্যাদি ছদ্মবেশী বিভাজন মূলক কর্মকৌশাল নিয়ে ধীর অথচ পরিকল্পিত পদক্ষেপে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের সুগভীর চক্রান্তর জাল বিস্তার করে তুলেছে। এবং ইতোমধ্যেই তাদের ঐ অবৈধ রাজনৈতিক অপতৎপরতা, অর্থনৈতিক শোষণ, ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত ও দেশের ঐক্যবিনাশী বিভাজনমূলক ষড়যন্ত্র দেশের মানুষকে এনজিও-গোষ্ঠী সম্পর্কে তীব্র মনোভাবাপন্ন ও এনজিওবিরোধী হিসাবে গড়ে তুলেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই ধরনের রাজনৈতিক অপতৎপরতায় অংশ গ্রহণ করে এবং জনবিরোধী-তৎপরতা, আর্থিক অনিয়ম, নারী নির্যাতন (ধর্ষণ) ও ইসলামবিরোধী কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে গণবিক্ষোভের মুখে 'গনসাহায্য সংস্থা' নামক (GSS) একটি বিশাল আকারের এনজিও মাত্র ক' বছর আগে বন্ধ হয়ে যায়। ঐ এনজিও প্রধান ফ.র.ম. মাহমুদ হাসানকে গণসাহায্য সংস্থার নির্যাতিত মহিলা কর্মীরাই ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে ধাওয়া এবং "নিষিদ্ধ" ঘোষণা করে। একইভাবে, দেশের বিভিন্ন

www.pathagar.com

স্থানে ব্র্যাক, প্রশিকা, কারিতাস ও গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকতা-কর্মচারীদেরও তাদের ধর্মবিধ্বংসী ও নারী নির্যাতনধর্মী কর্মকান্ডের জন্যে গণআক্রোশের শিকার হতে হয়েছে। ১৯৯২ সালের ২০ আগস্ট এনজিও দের বড় ফেডারেশন সংস্থা এডাব-কে 'রাষ্ট্রবিরোধী ও বিপদজনক" (Anti-State and Dangerous) বলে অভিহিত করে এনজিও ব্যুরো এক পত্র প্রদান করে এবং তাদের লাইসেন্স বাতিল করে। (PACT Bangladesh, Press-comments on NGOs, September 23, 1992) এরপর থেকে, এডাব ও অন্যান্য সদস্য এনজিও-দের বিরুদ্ধে অজস্র অভিযোগ এবং নালিশ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এডাব-এর প্রাক্তন চেয়ারপার্সন ও প্রশিকার প্রধান কাজী ফারুক আহম্মদ, বর্তমান এডাব চেয়ারপার্সন খুশী কবির, কারিতাসের মিঃ টিম, অধুনালুপ্ত গণসাহায্য সংস্থার ফ.র.ম. মাহমুদ হাসানসহ অন্যান্য এনজিও প্রধানগণ তাদের এনজিও-তৎপরতার অংশ হিসাবেই তথাকথিত "অপারেশন ফতোয়াবাজ" খ্যাত নব্বই-দশকের শেষের দিকে শুরু করে ইসলাম ও আদর্শ নীতি-নৈতিকতা বিরোধী জাতিবিধ্বংসী জঘণ্য কর্মকান্ড। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে (বগুড়ার কাহালুনন্দীগ্রাম, সিলেটের মৌলভীবাজারের ছাতকছড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি) নিরীহ ও সম্মানিত আলেম-ওলামা, মসজিদ-মাদ্রাসা ও ধর্মীয়ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে জঘণ্য অপপ্রচার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইসলাম ধর্মের পবিত্র স্তম্ভ ফতোয়া, তালাক, আযান, মাদ্রাসা ইত্যাদিকে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চোখে বিতর্কিত ও ঘৃনিতভাবে চিত্রিত করার হীন উদ্দেশ্যে উক্ত এনজিওগুলো তাদের ইসলামবিরোধী "অপারেশন ফতোয়াবাজের" অবতারণা করে। এদের ঐ হীন ইসলামবিধ্বংসী অপারেশনের অংশ হিসেবে ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে দু'বার প্রশিকা ও এডাবের নেতৃত্বে (কাজী ফারুক, খুশী কবির প্রমুখের পরিচালনায়) এনজিওচক্র ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক নগ্ন মাদ্রাসা ও আলেম-ওলামা বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। তার ফলশ্রুতিতে গত বছর (২০০০) ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইসলামবিরোধী এনজিও চক্র ও তাদের সমর্থক ধর্মনিরপেক্ষবাদী আওয়ামী লীগের লেলিয়ে দেয়া বাহিনীর হাতে দশ-বারজন সম্মানিত হাফেজ, আলেম ও মাদ্রাসা ছাত্র নিহত ও শত শত সাধারণ মানুষ আহত হয়। এনজিও-দের নির্বাচনী রাজনীতেতে অংশগ্রহণের প্রথম প্রকাশ্য প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৯৬ সালের পূর্বাহ্নে কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তৎকালীন সরকার বিরোধী আন্দোলনে। ঐ সময় কাজী ফারুক, খুশী কবির, মাহমুদ হাসান প্রমুখ প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগ আয়োজিত তথাকথিত জনতার মঞ্চে আওয়ামী লীগের সমর্থনে যোগদান করে উস্কানিমুলক বক্তব্য রাখেন। একই

www.pathagar.com

সময়ে এডাব নিয়ন্ত্রণভুক্ত ধর্মনিরপেক্ষবাদী এনজিও সংগঠন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয়পার্টিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে "ভোটার গণসচেতনতা বৃদ্ধি" প্রোগ্রামের ছদ্মনামে দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ঐ সময় এডাব (৭-১৫ জুন, ১৯৯২) গণতন্ত্র, সচেতনতা, শিক্ষা সমন্বয় প্রোগ্রামের Democracy Awareness Education Co-ordination Programme নাম নিয়ে তাদের কর্মী প্রশিক্ষনে আয়োজন করে। (Source: ADAB Annual Report, 1996-97, P-45) এসব ওয়ার্কসপ, সেমিনারে এডাব ও অন্যান্য এনজিওগুলো মূলতঃ নিরীহ ভোটারদেরকে সচেতনতা (!) বৃদ্ধির নামে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী দল ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৌলবাদী, স্বাধীনতাবিরোধী ইত্যাদি অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের ভোট দিতে অনুপ্রাণিত করে। এডাব ও প্রশিকার সঙ্গে ঐ নির্বাচনী তৎপরতার গণসাহায্য সংস্থা, কারিতাস, সিসিডিবি, সমতা সমাজকল্যাণ সমিতি (ঝইকঝ) সহ আরো নানা বিদেশী অর্থপুষ্ট এনজিও ইসলাম ও জাতীয়তাবাদী দল সমুহকে পরাভূত করতে ভূমিকা রাখে। তারা তাদের কর্মী বাহিনী ও ঋণের আওতাভূক্ত উপকৃত-ঋণগৃহীতা ভোটারদের রাজনৈতিক মতামতের পক্ষে প্রভাবিত করে এবং ভয়-ভীতি ও অর্থ দিয়ে জামায়াত-বিএনপির বিরুদ্ধে ভোট দিতে বাধ্য করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালের উপ-নির্বাচনে সিসিডিবি এবং সমতা সমাজকল্যাণ সমিতি আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে ময়দানে নামে। এনজিও-দের এই নগ্ন নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের খবর জাতীয় সংবাদপত্রে গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয়। (সূত্রঃ পাবনা নির্বাচনের রিপোর্ট, দৈনিক আজকের কাগজ ১২ ডিসেম্বর '৯৮)

গত সাধারণ নির্বাচন নিয়েও এডাব ও তার সদস্য সংগঠন প্রশিকা, নারীপক্ষ, কারিতাস প্রভৃতি এনজিও তাদের নির্বাচনী নীতি ঘোষণা করেছে। সেখানে তারা বলেছে, "নির্বাচনে আমরা প্রাগ্রসর এবং মুক্তিযোদ্ধের পক্ষের ধর্মনিরপেক্ষবাদী প্রার্থীদের সমর্থন এবং যুদ্ধাপরাধী, মৌলবাদী ও স্বাধীনতা বিরোধীদের বিপক্ষে কাজ করব" (Source: 21 May 2001, The Independent)। আরো জানা যায়, এডাব তাদের নির্বাচনী তৎপরতার মোট দু'কোটি ভোটারকে জনসচেতনতার (!) নামে মৌলবাদ তথা ইসলামী দলগুলোর বিরুদ্ধে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা তথা আওয়ামী লীগ ও কমিউনিষ্টদের পক্ষে প্রভাবান্বিত করার প্রচারনা চালাচ্ছে। এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তারা ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ কপি ক্ষুদ্র পুস্তিকা, পোস্টার, লিফলেট, ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদি তৈরী ও বন্টন সম্পন্ন করেছে। এদের বেশীর ভাগ তৎপরতা , প্রকাশনা ও প্রপাগান্ডা আওয়ামী লীগের পক্ষ এবং ইসলাম ও

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী শক্তির (চার দলীয় জোট) বিরুদ্ধে কাজ করছে বলে প্রতিভাত। ১৯৯৬ সালে ইউ.এস.এইড. (US-AID), এশিয়া ফাউন্ডেশন (ASIA FOUNDATION), ব্র্যাক (BRAC), ওয়েভ (WABE), এফ.বি.এস. (FBS), উত্তরণ (UTTRAN), প্রশিকা (PROSHIKA), জি.এস.এস. (GSS), এডাব (ADAB) প্রভৃতি সংস্থা সম্মিলিত ভাবে " স্থানীয় গণতন্ত্র শিক্ষা প্রকল্প" (The Local Democracy Education Programmme NLDEP) পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ঐ সম্মিলিত নির্বাচনী কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল এনজিও সমর্থক প্রার্থীদের বিজয়ী করে ক্ষমতায় বসানো। তৃনমূল পর্যায়ে এনজিওশক্তিকে ক্ষমতায় বসানোই ছিল ঐ উচ্চ বিলাসী রাজনৈতিক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। (Source: The weekly Dhaka Courier,11 Sepember, 1998) একই পত্রিকায় এনজিও-দের তৃনমূল পর্যায়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ঐ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনে বিভিন্ন এনজিও সমর্থিত প্রার্থীরা বিপুল পরিমাণে চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী হয়। যার মধ্যে IBS ৭১টি, উত্তরন ৭৪৪টি, BNPS ৩টি, RDS ৩৭৫টি, BS ৩২৬টি এবং WABE ৩১ সিট লাভ করে। একই ভাবে, ১৯৯৫-৯৬ সালে নির্বাচনী রাজনীতিকে প্রভাবিত করার জন্যে গণসাহায্য সংস্থা (জিএসএস) কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাদের প্রকাশিত বিভিন্ন নির্বাচনী বুলেটিন, ম্যানুয়েল ও অন্যান্য নির্দেশিকা বিশ্লেষণে। (Source: GSS Report, Manual for UP Election, No. CL-5/SM-0098/SE/95 and LC-2/SMDP 007/FEB/96)।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এনজিও সমূহের অবৈধ অংশগ্রহণে বিরক্ত হয়ে ব্র্যাক প্রধান ফজলে হোসেন আবেদ তৎকালীন এডাব চেয়ারপার্সন কাজী ফারুককে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করেন বলে জানা যায় এবং তাদেরকে এমন রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে নিবৃত্ত থাকার পরামর্শ দেন (সূত্রঃ ১৭ মার্চ, ১৯৯৬, দৈনিক বাংলা)। আগামী নির্বাচনে এনজিও সমূহ যে বিপুল নির্বাচনী পরিকল্পনা নিয়ে অংশ গ্রহণে উদ্ধত হয়েছে সেসবের সম্ভাব্য ভূমিকার বিষয়ে বিশদ রিপোর্ট ছাপা হয় আওয়ামীপন্থী দৈনিক ভোরের কাগজের ১১ জুলাই (২০০১) সংখ্যায়। ফেমা, (FEMA) জানিপপসহ বিভিন্ন নির্বাচনী পর্যবেক্ষন গ্রুপ বা এনজিও যারা নির্বাচন পর্যবেক্ষনের জন্যে শত শত কোটি টাকার ফান্ড ও লোকবল জড়ো করছে তাদের অনেক নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে রাজনৈতিক মতাদর্শী সুস্পষ্ট দলীয় রাজনীতির প্রভাবে দুষ্ট বলে জানা যায়। উদাহারণ হিসেবে বলা যায়, ফেমার শওকত আরা হোসেন ও জানিপপের ড. নাজমুল দু'জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালেয়

www.pathagar.com

আওয়ামী পন্থী "নীল দল"-এর সমর্থক এবং দু'জনই আওয়ামী লীগের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিতর্কিত "নিরাপত্তা বিল-২০০১" -এর পক্ষে নীল দলের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ঘাদানিক শিক্ষকদের যৌথ বিবৃতিতে দস্তখতকারী। শওকত আরা হোসেনের বেগমের স্বামীও একজন কট্টর আওয়ামীপন্থী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নীল দলের নেতা- যিনি আওয়ামী আমলে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক বা ডিজি হিসেবে চাকুরী করেন। (সূত্রঃ ৩১ মে ২০০১, ডেইলী স্টার) একইভাবে দেখা যায় যে, তৎকালীন ফেমা'র চেয়ারম্যান ফখরুল আহমদ '৯৬ এর নির্বাচনের পরপরই আওয়ামী লীগের সমর্থনে ঐ নির্বাচনকে একটি সুষ্ঠ নির্বাচন বলে স্বীকৃতি দেন এবং বিএনপি উপস্থাপিত "সূক্ষ্ম কারচুপি'র দাবিকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে অভিমতটিকে 'সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং পক্ষপাতদুষ্ট' বলে নাকচ করে দেন। আরো দেখা যায় যে, ফেমা, জানিপপ প্রভৃতি সংস্থা প্রকাশ্যে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন প্রভৃতি আইনগতভাবে বৈধ ও প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় রাজনৈতিক সংগঠনকে মৌলবাদী, তমাশাবাদী প্রভৃতি বলে সমালোচনা করে এবং এদের বিরুদ্ধে ভোটার-সচেতনতাবৃদ্ধি প্রচারণার নাম করে এসব নির্বাচন পর্যবেক্ষণের খোলসধারী এনজিওগুলো প্রকাশ্যেই তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে ও অপছন্দের দলগুলোর বিরুদ্ধে তাদের মনগড়া এবং উদ্দেশ্যেমূলক রিপোর্ট প্রদান করে দেশ-বিদেশের মহলসমূহকে বিভ্রান্ত করছে। গত ২রা এপ্রিল, ২০০১ সালের ইংরেজী দৈনিক The Daily Observer "FEMA Volunters meet Held" শিরোনামে একটি রিপোর্ট ছাপে-যেখানে তারা ইয়াংম্যান-খ্রীষ্টাণ এসোসিয়েশন(ণগঈঅ), ইয়াংম্যান উইম্যান খ্রীষ্টাণ এসোসিয়েশন (YWCA), SCI এবং জার্মান সম্প্রীতি সমিতি প্রভৃতিকে নিয়ে ঐ স্বেচ্ছাসেবী (Volunters) সম্মেলন করে। উল্লেখ্য যে, FEMA -এর এ সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারীর বেশীর ভাগই খ্রীষ্টাণ মিশনারী দলের সদস্য। তাছাড়া, ফেমা, জানিপপ, কারিতাস ও ব্র্যাকের তহবিলের উৎস বিভিন্ন ইহুদী ও খ্রীষ্টাণ নিয়ন্ত্রিত বিদেশী ডোনার এজেন্সি। স্বাভাবিক কারণেই এসব দাতা সংস্থা তাদের শত শত কোটি টাকার এনজিও ফান্ড যাতে মৌলবাদী তথা ইসলামী দলগুলোর বিজয়কে নস্যাৎ করার পেছনে ব্যয় হয় সেভাবেই তাদের মদদপুষ্ট এনজিওগুলোকে চাপ দিয়ে থাকবে। একটা অরাজনৈতিক এনজিও হওয়া সত্বেও FEMA আওয়ামী ও অন্যান্য লিঙ্গ বিভেদক গোষ্ঠীর সাথে সুর মিলিয়ে আসছে নির্বাচনে মহিলা আসন ৩০ থেকে ৬৮টি তে উন্নীত করার জন্যে নির্বাচন কমিশনে দাবি উপস্থাপন করে যা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূর্ন (সূত্রঃ ১৬ জানুয়ারী, ২০০১ দৈনিক আজকের কাগজ)।

www.pathagar.com

জাতীয় দৈনিক পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম থেকে আগামী নির্বাচনে এডাব, প্রশিকার মত বিদেশী মদদপুষ্ট এনজিও'দের সরাসরি নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ নেয়া এবং বিশেষ করে দেশের জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থী জোটকে পরজিত করার জন্যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। এসবের মধ্যে রয়েছে ৪ ঘন্টা ব্যাপী ভিডিও চলচ্চিত্র - যার মধ্যে বিএনপি, জামায়াত ও ইসলামী দলগুলোর দূর্বলতা বের করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। উপরোন্তু তাতে ভোটারদেরকে জামায়াত ও ইসলামী দলগুলোর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার ব্যবস্থাও করা হয়েছে (সূত্রঃ ১ জুন ২০০১, দৈনিক সংগ্রাম/২৯ এপ্রিল ২০০১, দৈনিক সংবাদ)। গত ফেব্রুয়ারী মাসে দেশের বিগত সরকারপন্থী এবং চরম ইসলাম বিদ্বেষী দৈনিক জনকন্ঠ প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এনজিও-দের কেন্দ্রীয় সংগঠন এডাব আগামী নির্বাচনে ভোটারদের জনমত জানার জন্যে এক বিশদ জরিপ কাজ পরিচালনা করেছে। রিপোর্টিতে সুস্পষ্টভাবে এডাবের রাজনৈতিক মতামত ফুটে উঠেছে। তাতে বলা হয়েছে যে, "নৈতিক কারণেই সেই জরিপকার্যটিতে মৌলবাদের জন্যে কোনই সুযোগ রাখা হয়নি"। আর এতেই এডাবের মত একটি বিদেশী মদদপুষ্ট এনজিও ফেডারেশনের চরম ইসলাম বিদ্বেষী এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব ধরা পড়ে (সূত্রঃ ১ ফেব্রুয়ারী ২০০১, দৈনিক জনকন্ঠ)। দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত অন্য একটি রিপোর্টে দেখা যায়, এনজিও গুলো সরাসরি ৬০ জন তাদের নিজস্ব প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামানোর চিন্তাভাবনা করেছে। তাদের এ উদ্যোগকে সফল করার জন্যে ১০টি ইসলাম বিদ্বেষী এনজিও সম্মিলিত ভাবে এক বিপুল তহবিল গড়ে তুলেছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়, এই সম্মিলিত নির্বাচনী রাজনীতির মূলে রয়েছে, "মৌলবাদ (Fundamentalist) প্রতিহত ও নারী সমাজকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা " (সূত্রঃ ২১ মে ২০০১, ইনকিলাব)। গত ২০ মে ২০০১, দৈনিক আজকের কাগজ ও দি ইনডিপেনডেন্ট -এ প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, বিএনপি আগামী নির্বাচনে এনজিও সমূহের পক্ষপাতদুষ্ট রাজনৈতিক প্রচারনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রিপোর্টদ্বয় থেকে জানা যায়, বিএনপি আশঙ্কা প্রকাশ করছে যে, আগামী নির্বাচনে এনজিও-রা রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে প্রচারণা ও অন্যান্য নির্বাচনী রাজনৈতিক তৎপরতায় অবতীর্ণ হচ্ছে। বিএনপি অভিযোগ করে যে, '৯৬ এর মতোই এসব দুষ্ট এনজিও চক্র আওয়ামী লীগের পক্ষে সূক্ষ্ম কারচুপির কাজ করবে। এবিষয়ে ইঙ্গিত করতে গিয়ে এডাব নেতৃত্বাধীন "সম্মিলিত নাগরিক আন্দোলন" নামক নির্বাচনমুখী নবগঠিত এনজিও চক্রের কথা উল্লেখ করে। শুধু তাই নয়, এনজিও'দের এই জঘণ্য

www.pathagar.com

রাজনৈতিক অপতৎপরতা বন্ধ করতে বিএনপি বিদেশী ডোনার এজেন্সিগুলোকে (পত্রমারফত) অভিযোগও পেশ করেছে। (সূত্রঃ ২০ মে ২০০১, আজকের কাগজ ও দি ইনডিপেনডেন্ট) গত ১৬ মে, দৈনিক মানবজমিন প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এডাব ও প্রশিকা-র রাজনৈতিক অপতৎপরতায় এবং নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে আশা, গ্রামীণ ব্যাংক এবং ব্র্যাকের নেতৃস্থানীয় (কতিপয়) কর্মকর্তাবৃন্দও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এসব এনজিও নেতৃবৃন্দ এডাব ও প্রশিকার রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচনী অপতৎপরতাকে 'ভুল এবং অবৈধ' বলে মত প্রকাশ করেন (সূত্রঃ ১০ মে ২০০১, মানবজমিন)। খোদ আওয়ামীপন্থী বলে পরিচিত অপর একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, উত্তরবঙ্গে তৎপর মোট ৪১টি এনজিও'র ২৬টি এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী সরাসরি রাজনীতিতে জড়িত এবং তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সরাসরি অনুগত (*সূত্রঃ ১২ এপ্রিল ২০০১, সংবাদ*)।

উপরোল্লেখিত সব প্রমাণ, রিপোর্ট এবং তথ্যপঞ্জী থেকে দেখা যায় যে, দেশের রাজনীতিতে বিশেষ করে নির্বাচনী তৎপরতায় বিদেশী মদদপুষ্ট দেশী-বিদেশী এনজিও এবং মিশনারী গ্রুপ এবং চক্র সরাসরি জড়িয়ে পড়েছে। তারা সরাসরি দলীয় রাজনীতিও শুরু করেছে। গত নির্বাচনেও তাদের মধ্যে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে বিপুল অংকের ফান্ড ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়ে নির্বাচনী ময়দানে অবতীর্ণ হবার উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। তা সত্বেও নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির জোট সরকার বিপুলভাবে বিজয়ী হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বেগম খালেদা জিয়া এনজিও'দের রাজনীতিতে নাক গলানোর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের হুশিয়ারী উচ্চারণ দেশবাসীর মনে আশার সঞ্চার করেছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা কমিটি এনজিও'দের সেবামূলক কাজে সার্বিক সহযোগীতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং রাজনীতির ময়দান থেকে দূরে রেখে দেশ সেবার কাজে সরকারের সহযোগী শক্তি হিসাবে তাদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের এই উদ্যোগকে দেশের প্রকৃত এনজিও নেতৃবৃন্দ স্বাগত জানালেও তথাকথিত দেশ সেবার নামে মতলববাজদের মাথা ব্যাথা শুরু হয়েছে। জনগণও চায়- সেবার আড়ালে ঐসব তথাকথিত মতলববাজদের চিহ্নিত করা হউক।

লেখকঃ প্রফেসর, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম ঃ সেবা ও রাজনীতি মূল্যায়ন

মুহাম্মদ আবু ইউসুফ
নার্গিস ফারহানা

বাংলাদেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। ঘনবসতিপূর্ণ পৃথিবীর এই দরিদ্র দেশটি এনজিওদের বাজার হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। ছোট-বড়, দেশী-বিদেশী সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজারেরও অধিক সংগঠন নানা ধরনের কর্মসূচী নিয়ে এদেশে কাজ করছে।[১] সুলতানী আমলে এদেশটি মোটামুটি সমৃদ্ধ ছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। অতীত সমৃদ্ধির জন্য এদেশকে সোনার বাংলা বলা হত। ইব্‌নে বতুতার সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, এটি সত্যিই সমৃদ্ধশালী ছিল। তিনি তাঁর লেখায় এটিকে প্রাচুর্য্যের দোজখ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২] মোঘল আমলেও এদেশটি সম্পদশালী ছিল। এমন কি নবাব শায়েস্তা খাঁয়ের আমলে এখানকার মানুষ সুখে, শান্তিতে ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে বসবাস করত। এদেশের সম্পদ লুট করে নিজেদের ভাগ্য গড়ার অন্বেষণে যুগে যুগে এখানে হামলা হয়েছে বার বার। পর্তুগীজ জলদস্যু, মারাঠা, ফরাসী, ইংরেজ ও মগেরা এখানে এসেছে। অবশেষে ১৭৫৭ সালে ইংরেজগণ চুড়ান্তভাবে ক্ষমতা দখল করার পর প্রায় দুইশত বছর একই সাথে এদেশকে শাসন ও শোষন করতে থাকে।

চির স্বাধীনচেতা ও লড়াকু এ জাতি পরাভব মানার বদলে যুদ্ধ করে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭১ সালে আবার দ্বিতীয় দফা স্বাধীনতা অর্জন করে। দু' দু'বার স্বাধীনতা লাভ ও নেতৃত্বের হাত বদল ছাড়া সাধারন মানুষের ভাগ্যের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। বরং অর্থনৈতিক দূরবস্থা, রাজনৈতিক অচলবস্থা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস যেন মানুষের নিত্য সঙ্গী হিসেবে স্থায়ী আসন করে নেয়। এ সুযোগ কাজে লাগায় নব্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রের উত্তরসূরীরা। জাতীয় উন্নয়নে নেতৃত্বদানে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বার বার। যে ব্যর্থতার গ্লানি আজও আমরা টেনে যাচ্ছি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনের জন্য শত সহস্রমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। সরকারী, বেসরকারী, দেশী-বিদেশী সব মিলিয়ে যে পরিমাণ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তাতে দারিদ্র কমার বদলে বাড়ছে কেন ? তা আজ এক মহাজিজ্ঞাসার বিষয়। এ প্রসঙ্গে দেশের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি একটু রসিকতা করে বলেছিলেন, "দারিদ্র বিমোচনের শত সহস্রমূখী এত ব্যাপক প্রচেষ্টার কারণে তো দারিদ্র বেচারা পালানোর পথ না পেয়ে আত্মহত্যা

www.pathagar.com

করার কথা ছিল, কিন্তু তা না করে বরং সে বীরদর্পে সামনে এগিয়ে চলছে"।[৩] এখন প্রশ্ন হলো এত অধিক সংখ্যক এনজিওর কর্মতৎপরতা, বিদেশী সাহায্য ও ঋণ প্রতি বৎসর ক্রমাগত বর্ধিত হারে আসার পরও কেন আমাদের এই দারিদ্র্যবস্থা ? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া আজ সময়ের দাবী। ১৯৭২ সালে আমাদের বৈদেশিক ঋণের বোঝা ছিল মাত্র ৩৫০ কোটি টাকা ।[৪] তখন আবার ৩০ হাজার তো নয় বরং ৩টি এনজিওর অস্তিত্বও মেলাভার ছিল। অথচ আজ ৩০ হাজার এনজিও সাথে প্রায় দশ হাজার কোটি টাকার ঋণভার। ১৯৭২ সালের তুলনায় আমাদের দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী লোক, ভূমিহীন, দরিদ্র ও হত দরিদ্রদের এবং জাতীয় পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ অনেক অনেক গুণ বেশী। তাহলে এত প্রচেষ্টার পরও আমরা কেন আমাদের দারিদ্রাবস্থা কমাতে পারিনি, এর পশ্চাতে কি কারণ রয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে।

এনজিও ঃ Non Government Organization সংক্ষেপে NGO নামে বিশেষভাবে পরিচিত। বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাগুলির পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত সংগঠন -যারা সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমোদন নিয়ে কাজ করছে, তাদেরকে এনজিও হিসেবে গণ্য করা হয়। আভিধানিক অর্থে বেসরকারী যে কোন সংস্থাকে এনজিও হিসেবে অভিহিত করা যায়। কিন্তু পারিভাষিক বা প্রকৃত অর্থে মুনাফার উদ্দেশ্যে গঠিত নয় এমন কোন বেসরকারী সেবা ও জনকল্যাণমূলক সংস্থাকে এনজিও বলা যেতে পারে।[৫] যা দেশের উন্নয়নও অগ্রগতির পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা পালনকারী হিসেবে কাজ করে থাকে। একটি দেশের উন্নয়ন কেবল মাত্র সরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব নাও হতে পারে। এ কারণে বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতা নেয়া হয়ে থাকে। সরকারী প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী এ প্রচেষ্টা নেয়ার প্রচলন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল। তবে বাংলাদেশে এ প্রচেষ্টা আজ ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। প্রথমতঃ এদেশের মত এত এনজিও পৃথিবীর আর কোন দেশে কাজ করে বলে জানা যায় না। দ্বিতীয়তঃ সরকারী কাজে এত হস্তক্ষেপ আর কোথায়ও হয় বলে মনে হয় না। যে কারণে এদেশে এনজিওদের প্যারালাল সরকার বলা হয়ে থাকে।

এনজিও কার্যক্রমের নানা পর্যায়

বৃটিশ আমলঃ বাংলাদেশে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টার সূচনা হয় মূলত ১৯৭০ এর দশক থেকে। এ সময় বর্তমান বাংলাদেশের (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের) উপর দিয়ে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। এ ঝড়ের তান্ডবতায় লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়, ঘর-বাড়ীর ধ্বংস সাধিত হয়। সহায় সম্পদ হারিয়ে মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকে। সরকারী, বেসরকারী, দেশী-বিদেশী সংস্থাগুলি মানুষের সেবায় এগিয়ে আসে। এভাবে তাদের পরস্পরের মধ্যে

www.pathagar.com

পরিচয় ঘটে ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ পরিচয় পরবর্তী এনজিও কার্যক্রম বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[৬]

১৯৭০ -এর দশকঃ স্বাধীনতা পরবর্তী সময় ১৯৭২ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এদেশে পূণর্বাসনের প্রয়োজনে অনেক দেশী-বিদেশী সংগঠন এগিয়ে আসে। দেশীয় সংগঠন হিসেবে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক) প্রথমে দরিদ্র জনগণের মধ্যে ত্রাণ কার্যক্রম এবং পরে ভারত প্রত্যাগত বাংলাদেশী নাগরিকদের পূর্ণবাসনের মাধ্যমে তার যাত্রা শুরু করে। ১৯৭৬ সালে একটি প্রকল্প হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক ও ১৯৭৮ সালে এসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট (আশা) নামক সংগঠন ও তার কার্যক্রম আরম্ভ করে।[৭]

৮০ -এর দশকঃ এ সময় এনজিও কার্যক্রম প্রসার লাভ করে। ৮০ এর দশকের পূর্বে বিশ্ব দু'টি শিবিরে বিভক্ত ছিল এবং বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লবীরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতনের পর একদিকে পুঁজিবাদী দেশগুলো সাহায্যের নামে তৃতীয় বিশ্বে তাদের নূতন প্রক্রিয়ায় কাজ শুরু করে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ একদল লোক এনজিও কার্যক্রম নিয়ে মাঠে নামেন। এ সকল লোকেরাই আজকের বাংলাদেশের প্রায় সকল বড় মাপের সংস্থাসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার।

৯০ এর দশকঃ এ সময়ে এনজিওদের সংখ্যা ও এর কার্যক্রম আরো ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অজুহাতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দাতা দেশ ও সংস্থাগুলি বেসরকারী সংস্থাসমূহকে গুরুত্ব দিতে থাকে। ফলশ্রুতিতে এ সময় এনজিওরা সরকারকে থোড়াই কেয়ার করতে থাকে। এমন কি এনজিওরা বিকল্প সরকারে পরিণত হয়।[৮] বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হল সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, নিরাপত্তা দপ্তরসমূহ, জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা দপ্তর, ডিফেন্স ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স এবং এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো।

এনজিও বিষয়ক প্রথম অধ্যাদেশটি ১৯৬১ সালে XLVI নং অধ্যাদেশ ছিল। এতে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরকে রেজিষ্ট্রেশনের দায়িত্ব দিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। কোন সংস্থা যদি ভূয়া কাগজপত্র দিয়ে রেজিষ্ট্রেশন করে, তবে তার ৬ মাসের কারাদন্ড অথবা দুই হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় ধরনের শাস্তি হতে পারে।[৯] এ বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যাদেশটি ১৯৭৮ সালের ১৫ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান জারী করেন। বাংলাদেশ আমলে এটি প্রথম অধ্যাদেশ। যা হল, বৈদেশিক সাহায্য (স্বেচ্ছা কার্যক্রম) বিধি অধ্যাদেশ। এ বিধি নিষেধের অধীনে চার্চসমূহকেও আনা হয়। এর কারণ ছিল স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার একদিকে যেমন ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ নীতি চালু করেন, অন্যদিকে মধ্য প্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল না থাকায় তাদের পরিচালিত কোন ইসলামী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এদেশে কাজ করত না। ফলে চার্চ ভিত্তিক সংগঠনসমূহ ব্যাপকভিত্তিক সুবিধা লাভ করে। এ সময় ১৯৭২-৭৫ সাল পর্যন্ত ৯টি খৃষ্টান মিশনারী দল বাংলাদেশে প্রবেশ করে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করা। দুঃস্থ, দরিদ্র, অসহায় মানুষের মাঝে তাদের পরিচালিত কার্যক্রম, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও প্রচারণা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হাজার বছরের লালিত মূল্যবোধের বিরোধী ছিল।[১০]

১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে ধর্মীয় রাজনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশ থেকে শ্রমশক্তি রপ্তানী করার জন্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং বিপুল পরিমাণ শ্রমশক্তি রপ্তানী করেন। তখন মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক ২/১টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বাংলাদেশে আগমন ঘটে। এর মধ্যে রাবিতা আলম আল ইসলামীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে ১৬টি বেসরকারী খৃষ্টান সংগঠনের কার্যক্রম উৎখাতের হুমকি দেয়া হলে পাশ্চাত্যের দাতা দেশসমূহ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার তাদের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করেন।[১১] জেনারেল এরশাদের শাসনামাল (১৯৮২-৯০) ছিল এনজিওদের জন্য সোনালী যুগ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ক্ষমতা লাভের পর তার প্রশাসনে ব্যাপক দুর্নীতির প্রসার লাভ করায় দাতা সংস্থাগুলি সরকারী প্রশাসনের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এনজিওদের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজ করাতে শুরু করেন।

বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম বিষয়ে এরশাদ সরকারের জারীকৃত প্রথম অধ্যাদেশ ছিল "Foreign Contribution (Regulation) ordinance 1982". এ অধ্যাদেশে বেসরকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ দান, অর্থ গ্রহণ, বিতরণ এবং ভ্রমণ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনের উপর কিছুটা কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। এসব বিধি নিষেধের কারণে বিদেশী অর্থনির্ভর বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি কিছুটা শংকিত হয়ে উঠে। তারা দাতাদেশ ও দাতা সংস্থাগুলির

www.pathagar.com

মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত দাতা দেশগুলোর দশম সম্মেলনে ৩টি দাতা দেশ সরকারী বিধি নিষেধ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করে।[১২] এ যাত্রায় সরকার দাতাদের বুঝানোর চেষ্টা করে যে, নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হল জাতীয় নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। এ নীতিমালা অন্য কোন কারণে নয়। তবে সরকার পরিস্কারভাবে বুঝতে পারে যে, তাদের আইনের শাসন দাতাদের চরমভাবে ক্ষুব্ধ করবে এবং সরকার এও বুঝতে পারে যে, এনজিওদের খুঁটির জোর কতখানি শক্ত।

১৯৮৬ সাল পর্যন্ত সরকার এনজিও বিষয়ে আর তেমন কোন উচ্চবাচ্য না করায় এনজিওদের কর্মতৎপরতা ব্যাপক হারে বেড়ে যায় এবং তারা রাষ্ট্রীয় নীতিমালা লঙ্ঘন করতে শুরু করে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৬ সালের ১৩ই মে অর্থমন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগের এনজিও শাখা এক প্রজ্ঞাপন জারী করে। তাতে বলা হয়, এটা সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে, অধিকাংশ এনজিও এবং তাদের সংশ্লিষ্ট এজেন্সীগুলো স্বেচ্ছা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদেশী সাহায্য গ্রহণ বিষয়ে বিধৃত আইন অনুসরণ করছে না। এটা সংশ্লিষ্ট সকলের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।[১৩] ১৯৮৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর সরকারের বহিঃসম্পদ বিভাগ এক নোটিশ জারী করে যাতে বলা হয়, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমের সাথে মুনাফা ভিত্তিক কিছু আয় সংস্থানকারী প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত, যাতে করে গরীব জনগোষ্ঠি ৩-৫ বৎসরের মধ্যে ধীরে ধীরে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। একই সাথে বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ বিষয়েও অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় বেসরকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এবং সর্বশেষ তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বেসরকারী সংস্থা বিষয়ে ঘোষিত অধ্যাদেশ বা বিধি নিষেধের কঠোরতা শিথিল করার দাবী জানায়। যেন তারা অধিক সুবিধাজনক অবস্থায় তাদের কার্যক্রম চালাতে পারে।

সরকারের উপর প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি করার জন্য ১৯৮৭ সালের ২৫-২৮ জুন এনজিওদের শীর্ষ সমন্বয়কারী সংগঠন এডাব-এর নেতৃত্বে এবং ইউএসএইডের (US-Aid) প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ৬০০ এনজিওর ১২০০ প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় সম্মেলন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ। এনজিওদের চাপের মুখে সরকার মন্ত্রণালয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন ও উদ্ভুত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য মন্ত্রণালয় বিভাগে একটি

www.pathagar.com

এনজিও বিষয়ক সেল প্রতিষ্ঠায় সম্মত হন। একই সাথে পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রতি বছর ৫টি এনজিওকে জাতীয় পুরষ্কারের কথা ঘোষণা করেন।[১৩] ১৯৮৭ সালের ১লা জুলাই ভূমি মন্ত্রণালয়ের এক স্মারকে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে সরকারী খাসজমি পূর্ণবন্টন কর্মসূচীতে বেসরকারী সংস্থা সমূহকে যুক্ত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়। সংসদে বিরোধী দলের ৫২ জন সদস্যের বিরোধীতার কারণে তৎকালীন ভূমিসংস্কার মন্ত্রী সিরাজুল ইসলাম খান কৃষক ও ভূমিহীন সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দেন যে, ভুমি বন্টন কার্যক্রমে সরকার বেসরকারী সংস্থাগুলোকে জড়িত করবে না। বেসরকারী সংস্থার লবিং, দাতাদের চাপ এবং বিরোধী দলের সমালোচনার কারণে এরশাদ সরকার বেসরকারী সংস্থাগুলোর প্রতি মোটামুটি ভারসাম্য নীতি অবলম্বন করেন। যাতে করে সকল মহল সরকারের উপর সন্তুষ্ট থাকে।

১৯৮৮ সালের ৭ই জুন বাংলাদেশের সংবিধানে অষ্টম সংশোধনী এনে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা করা হয়। এ সংশোধনী পাশ হবার পর পরই রেডক্রস সোসাইটির নাম পরিবর্তন করে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি করা হয়। এ পদক্ষেপে পাশ্চাত্যের অর্থপুষ্ট প্রধানত চার্চভিত্তিক বেসরকারী সংস্থাগুলি কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে আরো কোন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় কিনা সে ব্যাপারেও শংকিত হয়ে পড়ে।

১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশে এক সর্বগ্রাসী বন্যায় দেশের প্রায় তিন চতুর্থাংশ জেলা প্লাবিত হয়। সরকারের একার পক্ষে সকলের নিকট ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লে এনজিওরা এ সময় ব্যাপক কাজ করার সুযোগ পায়। বিদেশী সরকার ও দাতা সংস্থাসমূহ সরকারী কার্যক্রমকে অকার্যকর ও অফলপ্রসু হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং একই সাথে এনজিও কার্যক্রমের উপর সমধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। ফলে এনজিওসমূহ অর্থনৈতিকভাবে পরিপুষ্টতা লাভ করে।

১৯৯০ সালের জুলাই মাসে সরকার মন্ত্রণালয় বিভাগের এনজিও সেল বিলুপ্ত করে এনজিওদের তাবৎ কার্যক্রম অনুমোদন, তত্ত্বাবধান, সরকারী আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে এনজিও ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এরশাদ সরকার এক সময় এনজিওদের চাপে খৃষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট -এর প্রধান সুশীল কুমার অধিকারীকে রাষ্ট্রপতির এনজিও বিষয়ক উপদেষ্টা নিয়োগ করতে বাধ্য হন।

www.pathagar.com

১৯৯২ সালের জুলাই মাসে এনজিও ব্যুরো প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট একটি গোপন রিপোর্ট পাঠায়। এতে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কার্যক্রমকে অনিয়ম ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বিরোধী ও মারাত্মক কার্যক্রমের অভিযোগ আনা হয়।[১৫] এনজিও ব্যুরোর তদন্তে দেখা যায়, কতিপয় সংস্থা সরকারী নীতিমালা লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা এনে অননুমোদিত পন্থায় খরচ করছে এবং ব্যুরোতে কোন ধরনের রিপোর্ট দিতে অস্বীকার করে। তাদের ভাষায় (এনজিও ব্যুরোর তৎকালীন ডিজিকে লক্ষ্য করে) আমরা ভিক্ষা করে টাকা আনি এবং আমরা খরচ করি, তুমি হিসাব চাওয়া বা নেয়ার কে ? জানা যায়, এদের কেউ কেউ বাংলাদেশকে ৫০/১০০ বছরের মধ্যে খৃষ্টান রাষ্ট্র বানানোর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছিল। সরকারী আইন অমান্য, দুর্নীতি ও সর্বনাশা কাজের জন্য এ বছর ২০শে আগষ্ট এনজিও ব্যুরো এনজিওদের শীর্ষ সংগঠন এডাব ও সেবাসহ মোট ৩টি সংগঠনের রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করে দেয়। এ আদেশ রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকা মারাফত যথারীতি প্রচার করা হয়। সে সময় এ ঘোষণা দানের সাথে সাথে ৬টি বৃহৎ দাতা দেশের রাষ্ট্রদূতগণ পূর্বানুমতি ব্যতিতই প্রধানমন্ত্রীর অফিসে গিয়ে তাকে ২৪ ঘন্টার আল্টিমেটাম দেয়– যেন এ সময়ের মধ্যে বাতিলকৃত সংস্থার রেজিষ্ট্রেশন ফেরৎ দেয়া হয় এবং তাদের ভাষায় মৌলবাদী ডিজিকে অপসারণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাই করলেন। ডিজি শহীদুল আলমকে দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে বদলী করা হয়। এ ঘটনায় এনজিওদের সাহস, ক্ষমতা ও তৎপরতা বহুগুণ বেড়ে যায়। সে সময় নরওয়ে, নেদারল্যান্ড, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক ও অষ্ট্রেলিয়া সহ কতিপয় দেশে ব্যাপক প্রচারণা চলে, বাংলাদেশে এনজিও ব্যুরোতে একজন মৌলবাদী ডিজি আছেন, যিনি কোন এনজিওকে কাজ করতে দিচ্ছেন না। বিদেশী একটি খৃষ্টান সংগঠনের বাংলাদেশী একজন নির্বাহী কর্মকর্তা বাংলাদেশে ১৯৯২ সালের ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনার কারণে আগাম টাকা সংগ্রহ করতে গেলে উপরোক্ত দেশের অনেককে কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করতে শোনা যায় "আপনাদের দেশে কি সেই মৌলবাদী ডিজি এখনো আছেন ? তিনি কি আপনাদের কাজ করতে দেন ?

এনজিও ব্যুরোর রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়, দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারী সংস্থাটি এবং সাথে আরো অন্তত ৫০টি এনজিও সরকারের অনুমতি ছাড়াই বিদেশ থেকে ১.৪ বিলিয়ন টাকা সংগ্রহ করছে। এছাড়া আরো অনেক বেসরকারী সংস্থার অবৈধ ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে। তাদের কর্মচারীদেরকে সরকারী কর্মচারীদের চেয়ে অনেক গুণ বেশী পরিমাণ বেতন দেয়া হয়ে থাকে। এ কারণে

www.pathagar.com

অনেক সরকারী আমলা ও কর্মকর্তাগণ সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এনজিওতে চাকুরী নিয়েছেন। সে ধারা আজও অব্যাহত আছে। সরকারী আমলাদের চাকুরীতে থাকাকালীন নানা ধরনের সুবিধা দিয়ে তাদের দিয়ে কাজ আদায় করা হয়। যেমন; এনজিওদের অফিস ও আবাসনের জন্য, আমলাদের বাড়ী, উচ্চ ভাড়া ও অগ্রীম টাকায় ভাড়া নিয়ে ছেলে মেয়েদের বিদেশে পড়ানোর সুযোগ দান করে, পরিবার সহ বিদেশে শপিং করার টিকেট ও টাকা দিয়ে চিকিৎসার জন্য বিদেশে প্রেরণ করে। এবং চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার পূর্বে কনসাল্‌টেন্ট হিসাবে নিয়োগ দান করে। এছাড়া তো প্রজেক্টের কাজে গোপনে কনসালটেন্সী নিয়ে এবং ক্ষেত্র বিশেষে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে।

১৯৯৫ সালের কোপেন হেগেনে ১১ ও ১২ই মার্চ জাতিসংঘের ১৮৪টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথমবারের মত সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে গৃহীত দশ দফা সুপারিশমালার মধ্যে ২য় দফায় বলা হয়, চুড়ান্ত জাতীয় কার্যক্রম ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের দারিদ্র দূরীকরণ করা হবে। এতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র বিমোচনে ২০/২০ ফর্মূলা দেয়া হয়। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের দারিদ্র বিমোচন খাতে ২০% দেবে আর দাতারা ২০% দেবেন। এ কর্মসূচীর লক্ষ্য সরকারী ও এনজিও কার্যক্রমকে পরস্পরের পরিপূরক করা এবং এনজিওদের কার্যক্রমের পরিধি ও প্রভাব বৃদ্ধি করা।[১৬] এ সম্মেলনের অব্যবহিত পর পরই এডাব মানিক মিয়া এভিনিউতে বেসরকারী সংস্থাসমূহের একটি মহাসমাবেশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাদের লক্ষ্য ছিল কোপেন হেগেনের সিদ্ধান্তসমূহ জনগণকে জানানো। সরকারকে চাপের মুখে রাখা, নিজেদের প্রভাব বিস্তার করা। কিন্তু সরকার এ ধরনের সমাবেশ করার অনুমতি দেয়নি।

এনজিও কার্যক্রমের ক্ষেত্রসমূহঃ

৭০ এর দশকের শুরুতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় সমুদ্র উপকূলবর্তী বিশাল এলাকার জনগোষ্ঠির উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রলয়ংকরী জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত জনপদের মানুষের তাৎক্ষনিক সমস্যা সমূহ নিরসনের লক্ষ্যে স্বল্প পরিসরে এনজিও কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়, তা এখন আর ত্রাণ কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের পরিসীমা ও অর্থের প্রবাহ নিম্মের সারণী থেকে খানিকটা আঁচ করা যাবে। খানিকটা শব্দ ব্যবহারের কারণ হল, সারণীতে কেবলমাত্র যে সকল প্রকল্প ও প্রকল্পের জন্য ছাড়কৃত অর্থ সরকারীভাবে

www.pathagar.com

অনুমোদন করা হয়েছে তারই সিাব দেয়া হয়েছে। এর বাহিরে অনেক অনেক গুণ বেশী পরিমাণ অর্থ অননুমোদিত পন্থায় এসে থাকে বলে অনেকেই মনে করেন।

টেবিলঃ ১৯৯০ সাল থেকে ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত এনজিও ব্যুরো কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের জন্য অনুমোদিত ও ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণঃ

সময়, কাল জুলাই-জুন	*অনুমোদিত প্রকল্প*	*মোট এনজিও*	*অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ*	*ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ*
১৯৯০	৮	৩৮২	১৪,৮৯২,২৭৯.০০	১৪,৮৯২,২৭৯
১৯৯০-৯১	৪৬৪	৪৯৪	৬,৩৪১,৬৮০,২২৯.৩৩	৪.২৬৪,০৮০,৫২২.১৯
১৯৯১/৯২	৫৪৯	৬৩৪	১১,৪৮৪,৩৭৯,৪০৪.৬৭	৪,৮৬৫,৫২২,৮৪৪.৯৮
১৯৯২-৯৩	৬২৬	৭২৫	১৫,৯৯৫,৩৬৮,১১৬.৭৭	৭,৮২৮,২৩০,৬৮০.৭৮
১৯৯৩-৯৪	৫৮১	৮০৭	১২,৬০০,৯৬০,৭৮৬.৬০	৬,৮৪০,৩৬২,৫৩০.৪৩
১৯৯৫-৯৬	৫৭৯	৯১৯	১৭,৬২৭,৪৯৬,২৭৯.৩৯	৮,৩৮০,১৮৯,৭৪৮.৬১
১৯৯৬-৯৭	৭৪৬	১১৩২	১০,২৫৯,১৪৭,৬৮৪.৮০	১০,৪০০,৯৪১,১৩১.৮০
১৯৯৭-৯৮	৭০৫	১২৩৯	৮,৫২৪,৬৬০,২২৯.০০	৯,৩৬০,৭১৯,০১৯.০০
১৯৯৮-৯৯	১০৪৫	১৩৬১	১৮,২৪৭,৭৩৯,১৬৭.০০	১৩,১২৮,০২৪,৬৪১.০০
১৯৯৯-২০০০	৭৭৬	১৫০৬	১৩,৮৯৭,৬০১,৮৭১.০০	৯,৮৪৬,৯০২,১৮৫.০০
২০০০-০১	৮৬৮	১৬১২	১৯,৪১৪,৩৪১,৯৪৬.০০	১৩,৫৪৮,৪২৩,৩০০.০০
২০০১-০২	৫৪০	১৬৫২	১২,৯৩৩,৮১৩,০৮৮.০০	৯,০৯৬,২৪৪,৬৯৫.০০
	মোট		১৬২,০১৪,৫১৮,৭৭৭.৯৬	১০৮,১৫৮,৮৮৮,৫৭২.৩২

উৎসঃ Computer Section, NGO Affairs Bureau, March 2002 [১৭]

উপরোক্ত সারণী থেকে জানা যায়, এনজিও ব্যুরোর প্রতিষ্ঠাকালীন সময় অর্থাৎ ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত কেবলমাত্র সরকার অনুমোদিত পন্থায় বিভিন্ন প্রকল্পে এনজিওদের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হল, ১০৮,১৫৮,৮৮৮,৫৭২.৩২ টাকা। অননুমোদিত পন্থায় গৃহীত টাকার পরিমাণ অজ্ঞাত।[১৮] এনজিওরা সাধারণত যে সকল প্রকল্পে কাজ করে থাকে সেগুলি নিম্নরূপঃ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, মাইক্রো ক্রেডিট, স্বাস্থ্য, মহিলা উন্নয়ন, শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, ত্রাণ ও পূর্ণবাসন, উদ্বুদ্ধকরণ, কৃষি, মৎস ও পশু পালন, আইনী সহায়তা, শিশু মঙ্গল, অন্ধ পূনর্বাসন, শিশু সদন, বন ও পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, পল্লী ও শহর উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, ত্রাণ ও পরিবেশ, যুব উন্নয়ন, মৎস্য, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালী, মাদকাসক্ত পূনর্বাসন ও অন্যান্য।[১৯] উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও এনজিওদের বর্তমান কর্মক্ষেত্র এত ব্যাপক যে, মোবাইল ফোন, পোষাক, দুধ থেকে লবণ পর্যন্ত কোন কিছুই আর বাদ নেই।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে এনজিওদের ভূমিকা ও তৎপরতা আজ একটি বিতর্কিত অবস্থায় উপনীত হয়েছে। কেবলমাত্র তাদের সেবাধর্মী উন্নয়ন কার্মকান্ড করার কথা থাকলেও তারা যেভাবে রাজনীতিতে নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করছে তা রীতিমত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিষয়। আজ অনেকে তাদের এই রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কারণে একে বৃটিশ বেনিয়াদের এদেশে বনিকের বেশে এসে রাজদন্ড দখল করার পটভূমিকার সাথে তুলনা করছেন। বিগত স্থানীয়, জাতীয় নির্বাচন ও কিছু রাজনৈতিক ইস্যুতে তারা যেভাবে জড়িয়ে পড়েছেন– তাতে মনে হয় এখন সন্দেহ থেকে অপেক্ষার পালা কবে তারা ক্ষমতার মসনদ দখল করে বসেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এদেশের এনজিও সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ এক সময় নিবেদিত প্রাণ বাম রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা কর্মী ছিলেন। এমন কি বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তায় এদেশে বিপ্লব করার স্বপ্নও তারা দেখতেন।

১৯৯০ সালের জুন মাসে এনজিওদের কাজের সুষ্ঠু সমন্বয়, জবাবদিহিতা ও সরকারী নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্ন লিখিত নীতিমালার ভিত্তিতে এনজিও ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ক) সরকারী বা জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি না হলে উন্নয়ন কর্মকান্ডে এনজিওদের উৎসাহিত করা।

(খ) এনজিওরা যাতে সরকারী আইন ও নীতিমালার মধ্যে তাদের কর্মকান্ড সীমিত রাখে তা নিশ্চিত করা।

(গ) সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প বা তার সুনির্দিষ্ট অংশ এনজিওদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে।

(ঘ) বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিও সংস্থার নিবন্ধন ১৯৭৮ সালের আইন মোতাবেক এনজিও ব্যুরোতে হবে। এ ব্যাপারে ১২০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেযা হবে।

(ঙ) বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট এনজিও তাদের কার্যক্রম সরকার অনুমোদিত প্রকল্পসমূহে সীমাবদ্ধ রাখবে। প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য এনজিও ব্যুরোতে জমা দিতে হবে।

(চ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মতামতের ভিত্তিতে বিদেশী পরামর্শ দাতা উপদেষ্টা বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করবে।

(জ) যে সব ব্যাংক -এর মাধ্যমে এনজিও সমূহের বিদেশ থেকে অর্থ আসবে তারা প্রাপ্ত অর্থের হিসেব রাখবে এবং প্রতি ৬ মাস অন্তর এ ধরনের সাহায্যের হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালককে প্রদান করবে।[২০]

www.pathagar.com

আলোচ্য নীতিমালার কোথায়ও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতি অথবা রাজনীতি সংশ্লিষ্ট কোন কার্যক্রম করার অনুমোদন না থাকলেও তারা তা করে চলছে। ১৯৭৮ সালের ফরেন ডোশেন এক্ট (Foreign Donation Act '78) অনুযায়ী এনজিওদের রাজনৈতিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[২১] এনজিওরা দেশের উপর মহলে বেশ একটি শক্ত স্থান দখল করে রেখেছে।[২২] এরই সুযোগ নিয়ে তারা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপসহ নানা ধরনের বিধি বহিঃভূর্ত কাজ করে যাচ্ছে। ইউরোপ আমেরিকা সহ দাতা দেশসমূহ সরকারের চেয়ে এনজিওদের মাধ্যমে সাহায্য দিতে বেশী উৎসাহী। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্য সরকারের সাহায্য প্রয়োজন, তাই সরকার চুপ করে সব কিছু হজম করছে।[২৩] সরকার কোন ধরনের আইনের পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে এনজিওরা কখনো নিজেরা আবার কখনো দাতাদের মাধ্যমে সরকারকে শায়েস্তা করতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবোধ করে না।

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় বেশ কিছু এনজিও একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে সরাসরি প্রচারনায় নেমে পড়ে। তারা তাদের সাথে জড়িত উপকারভোগীদেরকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। আবার কেহ কেহ রাজনৈতিক বক্তব্য সম্বলিত বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছে এবং একটি বিশেষ ধরনের সাস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে।[২৪]

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের অব্যহিত পর পরই একটি বিশেষ রাজনেতিক দলের পরিচালিত আন্দোলনের সাথে কতিপয় নেতৃস্থানীয় এনজিও আন্দোলনের নামে তারা ইসলামী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার এবং একটি ইসলামী দলের নেতার ফাঁসির দাবীতে মিটিং, মিছিল, পোষ্টার, লিফলেট ও বিবৃতি দিয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তারা এনজিওদের আপত্তিকর কাজের বিরোধীতাকারীদের ধর্মান্ধ, প্রতিক্রিয়াশীল, মৌলবাদী, রাজাকার, আলবদর বলে প্রচারণা চালাতে থাকে।[২৫] "বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাতাদের চরমপত্র সাহায্য- পেতে চাইলে এনজিও বিরোধী ফতোয়বাজদের প্রতিহত করুন"।[২৫] দৈনিক জনতা ২৪-০৩-৯৪ ইং তারিখে এক রিপোর্টে জানায়- অতি সম্প্রতি স্থানীয় দাতাসংস্থার প্রতিনিধিদের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, আগামী মাসে অনুষ্ঠিত প্যারিস কনসোটিয়াম বৈঠকে উক্ত বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হবেন এবং সাহায্যের আশ্বাস প্রদানের আগেই ফতোয়াবাজদের উন্নয়নবিমুখ কর্মকান্ড প্রতিহত করতে সরকারের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার চাওয়া হবে।[২৭] অনুরূপ এক রিপোর্টে দৈনিক আজকের কাগজ জানায়, সম্প্রতি বিভিন্ন এনজিও কাজের ক্ষেত্রে ধর্মান্ধ, মৌলবাদী কিছু সংগঠনের বাধার

www.pathagar.com

মুখে পড়ছে। এনজিওদের কাছে দাতা দেশগুলো এই প্রতিকূলতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছে। বেশ ক'টি এনজিও লিখিতভাবে এসব মৌলবাদী তৎপরতা সম্পর্কে দাতাদের অবহিত করেছে। সূত্রমতে, প্যারিস কনসোটিয়ামে দাতাদের পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরত্বের সাথে উত্থাপিত হবে। দাতারা জানতে চাইবে, এই সব প্রতিবন্ধকতা কাটাবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো আরো জানায়, সাহায্যের নতুন শর্ত হিসাবে মৌলবাদী তৎপরতা বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের শর্ত পালনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও এনজিও বিরোধী তৎপরতার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবা হচ্ছে।[২৮] এই রিপোর্ট মোতাবেক বুঝা যায় এনজিওরা কেবলমাত্র নিজেরা নয় বরং দূতাবাস, দাতা সংস্থা ও দাতা দেশের মাধ্যমে সব সময় চাপ প্রয়োগ করে থাকে।

৪ঠা এপ্রিল '৯৪ দৈনিক জনকণ্ঠ এক রিপোর্টে জানায়, দেশের শীর্ষস্থানীয় এনজিওগুলো এনজিও বিরোধী ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানানোর সাথে সাথে তারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছে। তারা এনজিও ব্যুরোকে চিঠি দিয়ে তাদের কাজের ক্ষেত্রে বাধার কথা জানিয়েছে। ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসগুলো ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস এ ব্যাপারে এনজিওগুলোর কাছ থেকে তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের বক্তব্যও সংগ্রহ করছে। সাথে সাথে তারা এ ব্যাপারে তাদের উদ্বেগের কথা ও সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে।[২৯]

রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এনজিওদের সমন্বনয়কারী সংগঠন এডাব (ADAB) অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এ সংগঠনটিও আপত্তিকর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি এডাব- এর প্রধান সদস্যগণ অধ্যাপক গোলাম আযম বিতর্কে জড়িয়ে যান এবং নির্মূল কমিটির পক্ষে পত্রিকায় বিবৃতি দেন। এডাব প্রকাশিত অধুনা নামক বুলেটিনে জিয়াউর রহমান ও বিএনপি সম্পর্কে আপত্তিকর ও আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে।[৩০]

১৯৯৫ সালের ৫ই এপ্রিল দৈনিক ভোরের কাগজে বিবিসির সংবাদদাতা জনাব আতাউস সামাদ অতিথি প্রতিবেদক হিসেবে একটি রিপোর্ট করেন, যার হেডলাইন ছিল "সরকার ও এনজিও কি মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে" ? এডাব মানিক মিয়া এভিনিউতে সম্মেলন করার জন্য সরকারের নিকট এক আবেদন পত্রে জানায়, তারা কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহিত সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতি জনমত তৈরী ও সমর্থন জানানোর জন্য

www.pathagar.com

এক মহাসমাবেশ করবে। সরকার এ সম্মেলনেরও অনুমতি দেয়নি।[৩১] আসলে সামগ্রিকভাবে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করাই ছিল এ মহাসমাবেশের মূল উদ্দেশ্য। এ সমাবেশ করতে না দেয়ার কারণে তারা সরাসরি সরকার বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। প্রতিবেদনটিতে আরো উল্লেখ করা হয়, বিএনপি সরকার পছন্দ করুক আর নাই করুক বিএনপির জন্মের অনেক আগ থেকেই বেসরকারী সংস্থাগুলো এ ভূখন্ডে তাদের পছন্দসই কাজ করে যাচ্ছে। এ সমাবেশে বাধা দান সরকারের জন্য দাতাদের নিকট বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করবে।[৩২]

এনজিওরা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের কথা বলে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। বিভিন্ন সময় স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে এনজিওরা সরাসরি প্রার্থী দাঁড় করিয়ে এবং প্রচারনা চালিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। ইতোমধ্যে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার নামেও তারা নির্বাচনে অংশ নেন। তাদের কারো কারো ধারনা তারা বিধিবদ্ধ নিয়ম বহির্ভূত পন্থায় স্থানীয় সরকার প্রশাসনে নিরাপদ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলে জাতীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহন ও কর্তৃত্ব লাভ সহজতর হবে। অথচ ১৯৭৮ সালের বিধি মোতাবেক যে কোন ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা এনজিওদের জন্য নিষিদ্ধ।[৩৩]

দেশের অন্যান্য স্থানের মত পাবনা জেলার সাঁথিয়া, চাটমোহর, ভাঙ্গুরা, ফরিদপুর থানায় বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এনজিওদের মাধ্যমে ভোট কেনাবেচা হয়েছে প্রচুর। সাঁথিয়া থানার দুলাই ইউনিয়নের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ভোটার জানান তাদের এলাকার একটি বিশেষ এনজিও ভোট কেনার জন্য চেয়ারম্যান ও মেম্বার প্রতি যথাক্রমে ৩০০ ও ২০০ টাকা করে দেয়ার কথা বলেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক এনজিও কর্মী জানান, আসন্ন স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনের পর পর্যায়ক্রমে তারা জাতীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ করে ভবিষ্যতে তাদের কর্তৃত্ব নিরংকুশ করতে পারবে।[৩৪]

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে এডাবের নেতৃত্বাধীন সংগঠনসমূহ বিশেষত আশা, প্রশিকা, ব্র্যাক, আরবান, নিজেরা করি, গণসাহায্য সংস্থা, লেড, মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ, এএলআরডি প্রভৃতি সংগঠন প্রকাশ্য নির্বাচনী তৎপরতায় অংশ নেয়। তারা একটি বিশেষ দলের পক্ষে ও একটি বিশেষ দলের বিপক্ষে সরাসরি নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। তারা বলেছিল নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের দলকে ক্ষমতায় আনতে হবে এবং বিপক্ষ দলকে যে করে হউক হারাতে হবে। "এডাব প্রধান কাজী ফারুক তো নির্বাচনের পূর্বে বলেছিলেন এবারের নির্বাচনে জামায়াত ৬টির বেশী সিট পাবে না।[৩৫]

www.pathagar.com

২০০১ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে এডাবের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে এনজিওদের এক ঘরোয়া সমাবেশে জনাব কাজী ফারুক ঘোষণা করেন- "নিজামী, সাঈদী ও কামরুজ্জামানকে যে করে হউক হারাতে হবে এবং ঐ এলাকায় প্রদত্ত সকল ঋণ মাফ করে দেয়া হবে। আরো যত টাকা দরকার দেয়া হবে– শর্ত একটাই রাজাকারদের কোন অবস্থায় জিততে দেয়া হবে না"।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এনজিওদের হস্তক্ষেপ কোন একটি সময় বা কালে সীমাবদ্ধ ছিল না। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন, ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচন সহ সকল নির্বাচনে এনজিওরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণই কেবল নয় বরং সফল নায়কেরও ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। জাতীয় স্বার্থে আমাদের এ বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক হতে হবে।

এনজিও কার্যক্রমের মূল্যায়ন

এনজিওদের বাজার হিসাবে পরিচিত এদেশে দীর্ঘদিন থেকে তারা এত ব্যাপক ভিত্তিক ও বহুমুখী কাজ করছে যে, এ দেশের এমন কোন কর্মকান্ড নেই যা তাদের আওতার বাহিরে। বিগত ১৯৯০-২০০১ সাল পর্যন্ত এনজিওরা কেবল মাত্র বৈধ বা সরকার অনুমোদিত পন্থায় প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা এনেছে আমাদের দারিদ্র বিমোচনের জন্য। তাতে কি আমাদের দারিদ্র কোন অংশে হ্রাস পেয়েছে ? আমার মেনে হয় এ প্রশ্নের জবাবে হাঁ-এর বদলে না আসবে।

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা প্রায় ১৮শত কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য পেয়েছি। মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ বেড়ে ১৯৭৩/৭৪ সনে ৬.৬ ডলার থেকে ১৯৯৮/৯৯ সালে প্রায় ১৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১১৬ ডলারে এবং ১৯৭১/৭২ অর্থ বছরে যেখানে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি ডলার সেটা ১৯৯৮/৯৯ অর্থ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে ১৫৪ কোটি ডলারে।[৩৬] বিগত ৩০ বছরে এদেশে সরকারী ও এনজিও পর্যায়ে আগত ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্য আমাদের উন্নয়ন, ত্বরান্বিত করেছে অথবা দারিদ্র কমিয়েছে এমন নজির আজও কেউ পেশ করতে পারেনি। আমাদের দারিদ্রের মাত্রা হল ১৩ কোটি মানুষের মধ্যে ৬ কোটি মানুষ দরিদ্রসীমার নীচে বাস করে। ৯ কোটি মানুষের জন্য পয়ঃনিস্কাশনের ভাল কোন ব্যবস্থা নেই। প্রায় ৭ কোটি মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত, ৪ কোটি বয়স্ক মানুষ নিরক্ষর, প্রায় ২ কোটি শিক্ষা সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ১ কোটি শিশু অপুষ্টির শিকার, ডাক্তারী সহায়তা ছাড়াই ৩০ লক্ষ শিশুর জন্ম ও ২০ লক্ষ স্বল্প ওজন নিয়ে জন্মায়। প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ বেকার অথবা অর্ধবেকার।[৩৭] তাহলে প্রশ্ন এনজিওদের দারিদ্র মোচনের এত শতমুখী

www.pathagar.com

প্রচেষ্টার ফলাফল কোথায় ? কি কারণে প্রতি বছর দরিদ্র সীমার নীচে অবস্থানকারী ও ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে ? এর কোন সঠিক জবাব নেই।

বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণের দায় দেনার বোঝা ১৯৭১-১৯৯৯ পর্যন্ত

সাল	*মোট প্রদেয়*	*কিস্তি মূল*	*সুদ*	*মোট*
১৯৭১-৭৩	৯.১	-	-	
১৯৭৩-৭৮	২০৫.৬	১৫.৯	১০.০	২৫.৯
১৯৭৮-৮০	১১০.১	১৬.৬	৮.২	১৯.৭
১৯৮০-৮৫	২৮২.৯	৩৫.১	২৬.০	৬১.১
১৯৮৫-৯০	৪৬৫	৭৮.৪	৫১.৭	১৩০.১
১৯৯০-৯৫	৪২৯.৯	১২২.৩	৬৭.৬	১৮৯.৮
১৯৯৫-৯৯	৩০৮.৪	১৩১	৬০.২	১৯১.২
মোট	১৮০১	৩৯৪.২	২২৩.৬	৬১৭.৮

উৎসঃ বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজন বিগত ৩ দশকের পলিটিক্যাল ইকনমি আবুল বারাকত[৩৮], অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জার্মান পার্লামেন্টের দু'দুবার নির্বাচিত সদস্য ও জার্মান অর্থমন্ত্রকের মুখপাত্র বৃগিতে এরলাল এদেশে এনজিওদের সেবামূলক কাজ করতে এসে তাদের সেবাধর্মী কাজের আসল চেহারা দেখে উচ্চ বেতনের চাকুরীটিই কেবল ছেড়ে দেনটি বরং সাথে সাথে একটি বইও লিখেছেন, যার নাম হল, "সাহায্য না মরণাস্ত্র" ? বইয়ের নাম থেকেই আসল কাজের অবস্থা বুঝতে মোটেও কষ্ট হয় না। বইটিতে তিনি উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন। যেমন বিগত দুই দশক ধরে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে এই প্রকল্পগুলি কাদের স্বার্থে কাজ করছে ? কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে এদের অবদান কতটুকু ? প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রেই বা এরা কি করেছে ? স্বাস্থ্য ও পরিবার করিকল্পনা খাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যায়িত হচ্ছে তার পরিণামই বা কি ? মানবিক অধিকার রক্ষায় বা এদের ভূমিকা কতটুক ? তার মতে, সাহায্য প্রকল্পগুলো সারা দেশের প্রতিটি নাগরিকের সমানভাবে উপকারে আসার কথা থাকলেও তার বদলে সবার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিনি মনে করেন এই সব সাহায্য ছাড়াই বাংলাদেশের মানুষ ভালভাবে চলতে পারবে।[৩৯]

১৯৯৯ সালের ২রা মে ঢাকার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে একজন মার্কিন শিক্ষাবিদের এনজিও বিষয়ক কাজের উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে

www.pathagar.com

আলোচনা পর্বে ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তাজ হাশেমী এনজিও কার্যক্রমকে সুচতুর এক ছদ্ম ব্যবসায়িক তৎপরতা বলে অভিহিত করেন। তিনি এর নাম দেন এনজিও ব্যবসা। প্রফেসর হাশেমী প্রশ্ন করেন দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহণকারী দেশ যেমন; জাপান, কোরিয়া, হংকং, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া সহ পূর্ব এশিয়ার যে সব দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে তাদের কোনটির পেছনে কি এনজিওদের অবদান আছে ? তিনি আরো বলেন, এনজিওরা আসলে গরীব মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে বড় অংকের লাভজনক ব্যবসা করছে।[৪০]

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সলার প্রফেসর হাফিজ সিদ্দিকী বলেন, আমি মনে করি- আমাদের দেশের এনজিওদের প্রধান লক্ষ্য দারিদ্র বিমোচন তা আজও অর্জিত হয়নি। আর এনজিও চালিয়ে দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বেশীর ভাগ লোকই নিজের ভবিষ্যৎ গোছানো ছাড়া তেমন কিছু করতে পারেনি।

উপসংহারে এসে একথা বলা যায় যে, এনজিওদের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নমূলক কাজে কতখানি এবং কিভাবে লাগানো হবে তা নির্ভর করে সরকারের দৃঢ় নীতিমালা, কঠোর মনোভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের উপর। নৈতিক মনোবল না থাকলে আইন দিয়ে কোন কাজে আসে না। দেশের উন্নয়নের জন্য কোনটি প্রয়োজন এবং কতটুকু প্রয়োজন তা নির্ধারনের দায়িত্ব সরকারের। তবে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সব কল্যাণকর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে। অপব্যবহারের দরুণ কোন একটি ভাল জিনিসও যেমন খারাপ হয়ে যেতে পারে- তেমনি এনজিও কার্যক্রম দেশের কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনের বদলে বিপরীত ভূমিকা পালন করছে। আমরা মনে করি এর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার হওয়া উচিত।

তথ্য নির্দেশ

১. মুহাম্মদ এনামুল হক জাল্লাবাদী, এনজিওদের ষড়যন্ত্রের কবলে বাংলাদেশ। নাসিমা পাবলিকেসন্স, ১৯৯৯।

২. মোহাম্মদ শহীদুল আলম, বাংলাদেশের উন্নয়নে জনপ্রশাসনের ভূমিকা, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমী, শাহবাগ, ১৯৯৪।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. আবুল বারাকাত, বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য কতখানি প্রয়োজনঃ গত তিন দশকের অভিজ্ঞতার পলিটিক্যাল ইকনমি, ২০০১।

৫. ইকবাল কবির মোহন, বাংলাদেশে এনজিও আগ্রাসন, বাংলাদেশ রিচার্স সেন্টার, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

www.pathagar.com

৬. এএইচএম আব্দুল করিম, দারিদ্র বিমোচনে বেসরকারী সংস্থাসমূহের ভূমিকাঃ ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর একটি মূল্যায়ন ১৯৯৫।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. মুহাম্মদ এনামুল হক জাল্লাবদী প্রাগুক্ত
৯. প্রাগুক্ত।
১০. এএইচএম আব্দুল করিম প্রাগুক্ত।
১১. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টায় মুসলিম এইড বাংলাদেশের ভূমিকা ঃ ইসলামী মডেলের একটি সমীক্ষা ১৯৯৯।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. এএইচএম আব্দুল করিম প্রাগুক্ত।
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. মুহাম্মদ এনামুল হক জাল্লাবাদী প্রাগুক্ত।
১৭. এএইচএম আব্দুল করিম প্রাগুক্ত।
১৮. Prime Ministers Office, At al Glance, Computer Section, NGO Affairs Bureau March 2002।
১৯. মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, বাংলাদেশে এনজিও উপনিবেশবাদের দূর্ভেদ্য জালে, দি সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, নভেম্বর ১৯৯৭।
২০. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ প্রাগুক্ত।
২১. ইকবাল কবির মোহন প্রাগুক্ত।
২২. প্রাগুক্ত।
২৩. প্রাগুক্ত।
২৪. প্রাগুক্ত।
২৫. পর্যবেক্ষক/মোবায়েদুর রহমান/আনু মাহমুদ/ইয়াসির, এনজিও আগ্রাসনঃ সেবার নামে ষড়যন্ত্র, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৯৪।
২৬. প্রাগুক্ত।
২৭. ফতোয়া ১৯৯১-৯৫, আনিসুজ্জামান পরিষদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ।
২৮. দৈনিক জনতা ২৪-৩-৯৪
২৯. দৈনিক আজকের কাগজ ২৮-৩-৯৪
৩০. দৈনিক জনকণ্ঠ ৪-৪-৯৪
৩১. মুহাম্মদ এনামুল হক জাল্লাবাদী প্রাগুক্ত।
৩২. দৈনিক আজকের কাগজ প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

৩৩. প্রাগুক্ত।
৩৪. মুহাম্মদ এনামুল হক জাল্লাবাদী প্রাগুক্ত।
৩৫. প্রাগুক্ত।
৩৬. প্রাগুক্ত।
৩৭. আবুল বারাকাত প্রাগুক্ত।
৩৮. প্রাগুক্ত।
৩৯. প্রাগুক্ত।
৪০. বৃগিতে এরলাল, সাহায্য না মরনাস্ত্র ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ
৪১. মাহমুদ কাশেম, এনজিও বাণিজ্য মুখোশ উন্মোচন, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, এপ্রিল ১৯৯৯।

লেখক পরিচিতিঃ॥

মোহাম্মদ আবু ইউসুফঃ বিভাগীয় প্রধান, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ও পি-এইচডি গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নার্গিস ফারহানাঃ সহকারী শিক্ষিকা, শেরে-বাংলানগর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও এমফিল গবেষক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের তিন শত্রু ঃ ধর্মদ্রোহিতা, আধিপত্যবাদ ও এনজিও

আবদুল আউয়াল ঠাকুর

বাংলাদেশের জনগণ তিন শত্রু আক্রান্ত। এক. ধর্মদ্রোহী রাজনৈতিক, দুই. আধিপত্যবাদ তিন, তাদের সামাজিক সংগঠন একশ্রেণীর এনজিও। এই তিন শক্তি সম্মিলিতভাবে নেমে পড়েছে দেশের মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও স্বাধীনতার চেতনাকে ভোঁতা করে দিতে। ব্যাপারটি গত কয়েক দশক থেকে শুরু হলেও ক্ষমতার মদদে সাম্প্রতিকালে প্রকট আকার ধারণ করেছে। বলা যায়, এই শত্রুরা সম্মিলিতভাবে আধিপত্যবাদবিরোধী দেশপ্রেমিক জাতীয়াতাবাদী জনগণকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। কিন্তু কেন ? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে হলে শুধু বর্তমান নয়, অতীতে ফিরে যেতে হবে। এনজিও বা নন-গভর্ণমেন্ট সংস্থা বলতে বর্তমান সময়ে যা বুঝায় আগে এইসব সংগঠন বলতে অত কিছু না বুঝালেও এই অঞ্চলে এই ধরণের সংগঠনের অস্তিত্ব আগেও ছিল। সে সময়ে এইসব সংগঠনের কর্মপদ্ধতি খানিকটা আলাদা ছিল। সংগঠনগুলোর তৎপরতার আমল যদি ইংরেজদের আগে নির্ধারণ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে এ অঞ্চলের মুসলমান ও মুসলমান শাসকদের সাথে ইহুদী ও খ্রীষ্টান বিশেষ করে পর্তুগীজ খ্রীষ্টানদের বিরোধের সূত্রপাত হয় ৯০৪ হিজরী থেকে। ঐ সময় পর্তুগীজ খ্রীষ্টানদের ৪টি জাহাজ কান্দ্রিনা ও কালিকট বন্দরে নোঙ্গর করে। পরের বছর ৬টি পর্তুগীজ জাহাজ কালিকটে পৌছে। পর্তুগীজরা সেখান থেকে নেমে তখনকার শাকনকর্তাকে আরবের মুসলমানদের সাথে বাণিজ্য না করার আবেদন করে এবং বলে যে, তারা মুসলমানদের চেয়ে অধিক মুনাফা দেবে। স্থানীয় মুসলিম শাসককর্তা তা অগ্রাহ্য করেন। ফলে খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করেন। শাসনকর্তা মুসলমানদের পক্ষাবলম্বন করেন।। আক্রমণকারীরা ঐ শাসনকর্তার বিরোধপূর্ণ এলাকা কোচিনে দুর্গ গড়ে তোলে এবং সমুদ্র তীরবর্তী একটি মসজিদ ভেঙ্গে সেখানে গির্জা নির্মাণ করে। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে পর্তুগীজ খ্রীষ্টানদের অত্যাচার ক্রমাগত বাড়তে থাকায় শাসনকর্তা দু'তিনবার স্বসৈন্য অভিযান পরিচালনা করেন। শাসনকর্তা ইজিপ্ট, জেদ্দা, দক্ষিণ ও গুজরাটের শাসনকর্তাদের নিকট দূত প্রেরণ করেন। সুলতান কাবাসুর ঘোরি আমির হোসেন নামক একজন সেনাপতির অধীনে ১৩টি যুদ্ধজাহাজ ও অস্ত্রশস্ত্র ভারতীয় উপকূলে প্রেরণ করেন। গুজরাটের সুলতান মাহমুদ ও দক্ষিণের সুলতান মাহমুদ বাহমনিও বহুসংখ্যক জাহাজ সজ্জিত করে দিও, সুরাট, কোলাট, দাবিল ও জাবিল বন্দরগুলোতে পুর্তগীজদের বিরুদ্ধে পাঠান। যুদ্ধের প্রথমদিকে,

www.pathagar.com

মুসলমানরা বিজয়ী হলেও প্রতারণামূলক কৌশল অবলম্বন করায় পর্তুগীজরা যুদ্ধে প্রধান্য বিস্তার করে। ৯১৪ হিজরীতে রমজান মাসে পর্তুগীজরা কালিকট বন্দরে তথাকার জামে মসজিদ পুড়িয়ে দেয় এবং সমগ্র নগরী লুণ্ঠন করে। পরদিন মালাবারের অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে খ্রীষ্টানদের আক্রমণ করে ও ৫০০ নেতৃস্থানীয় পর্তুগীজকে হত্যা ও সমুদ্রে ডুবিয়ে মারে। যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা পালিয়ে যায়। অবশেষে পর্তুগীজরা প্রতিবার ৪০০০ মরিচ ও আদা আরবীয় বন্দরে রফতানীর শর্তে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় কিন্তু এই চুক্তি তারা রক্ষা করেনি। উপরোন্তু মুসলমান শাসকের শাসনকার্যে বাধা প্রদান করতে থাকে। পরবর্তীতে মোঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে ইংরেজরা বৈধভাবে বসবাসের জন্য সর্বপ্রথম অনুমতি লাভ করে। সম্রাট জাহাঙ্গীর ইংরেজ খ্রীষ্টানদের সুরাটে বসবাসের অনুমতি দেন। এরপর তারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাণী এলজাবেথের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য করার একচেটিয়া সনদ লাভ করে। বাংলার নবাবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ১৬৬৮ সালে ঢাকায় এবং ১৬৯৮ সালে কলিকাতায় কুটি স্থাপন করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরবর্তী কার্যক্রম পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেবার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বলে রাখা ভাল যে, নামমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বণিকের দন্ড রাজদন্ডে পরিণত হল। অর্থ ও শাসন লোভকে কার্যকর করতে ইংরেজ বেনিয়ারা প্রধানতঃ কূটনীতি ও মিথ্যাচারকে আশ্রয় করেছিল। ভারত দখলের পিছনে বেনিয়াদের প্রথম দিকটাতে রাজনৈতিক স্বার্থ যতটা ছিল তার চাইতে বেশী ছিল অর্থনৈতিক। উর্বর ভারতভূমির লোভেই এক সময় আর্য নামক আক্রমণকারীরা ভারতভূমি দখল করে নিয়ে বর্ণবাদের নিগড়ে আবদ্ধ করেছিল ভারতবাসীকে। মূল ভারতবাসীদের শূদ্র বানিয়ে শোষণ আর নির্যাতনের ছড়ি ঘুরিয়েছিল আর্য নামক ব্রাহ্মণরা। সেই ভারত বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের সোনাফলা মাটির দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দিয়ে ইংরেজ বণিকরা তাদের যাত্রা শুরু করে। করের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যে, ভারতীয় বিশেষ করে মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়া হয়। রাজকার্য থেকে বিতাড়িত করে মুসলমানদের এমন এক পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয় যে, সেখানে শুধু তাদের নির্যাতিত, নিগৃহীত হওয়ার অধিকারটুকুই ছিল। আর এ অন্যায় অমানবিক বর্বর কাজের জন্য ইংরেজরা ব্যবহার করেছিল এ দেশীয় হিন্দু শোষক সমাজকে। যে সনাতন হিন্দু শ্রেণী বহুত্ববাদিতায় নিমগ্ন ছিল তাদের অশিক্ষিতদের শিক্ষিত করে মদ আর নারীবক্ত করে গড়ে তোলা হল এক নতুন সমাজ। ইংরেজরা অত্যন্ত

www.pathagar.com

সচেতন ও সতর্কতার সাথে এই কাজটি সম্পন্ন করেছিল। কারণ তারা জানত, এই দু'টিই ছিল তাদের নতুন কৌশল এবং এতে কাজও হয়েছিল। দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের একশ' বছর শাসন করল বিলেতের কোম্পানীর অশিক্ষিত লোজজন। একশ' বছর কার্যকারণে মুসলমানদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খর্ব করার অপকৌশল গ্রহণ করা হল।

বৃটিশ ভারতের সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ভারতবর্ষের পুরনো সমাজ ব্যবস্থা বিশেষ করে মুসলিম মুল্যবোধ ধ্বংস করে এ দেশের জনগণকে খ্রীষ্টান বানাবার যে চেষ্টা করা হয়েছিল তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল সরকার। বেনিয়া সরকার ধর্ম প্রবর্তনের কোন মিশন নিয়ে এ দেশে না এলেও তারা অনুভব করেছিল, তাদের সমর্থিত একটি সামাজিক ভিত গড়ে তোলা দরকার। এই ভিত্তি গড়ার কাজটি করেছিল মিশনারীরা। যদিও নিম্নবর্ণের হিন্দুরাই প্রথম দিকে খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। কিন্তু কারা খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত হল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, ধর্ম প্রচারের নাম করে শাসকদের একদল বেসরকারী বাহিনী বৃটিশ রাজত্বে ঘুরে বেড়াবার লাইসেন্স পেল। প্রকাশ্যতঃ তারা কোন ঘটনার সাথে যুক্ত না থাকলেও অপ্রকাশ্যে তাদের কাজ ছিল ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে পাহারা দেয়া।

খ্রীস্টান শিনারীর কাজকেই আমাদের দেশগুলোতে বর্তমান একশ্রেণীর এনজিও'র দাদা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই দু'টি সংগঠনই সময়ের ব্যবধানে একই ধরনের কর্মসূচী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। এরা উভয়ই দারিদ্র বিমোচন করতে মাঠে নেমেছে। যে বেনিয়াদের শোষণে এ অঞ্চলের জনগণ নিঃস্ব হয়েছিল তাদেরকেই আবার খ্রীষ্টান বানিয়ে অর্থনৈতিক লোভ দেখিয়েছে মিশনারীরা। ইংরেজ বেনিয়াদের ভাঁওতাবাজি নিয়ে আলোচনা করলে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম সর্বাগ্রে উঠে আসবে। দত্ত কূলোদ্ভব এই জমিদার নন্দন বিলেত যাবার বড় খায়েস করে খ্রীস্টান হয়েছিলেন। কিন্তু তার সেই সাধ পূরণ হয়নি। ধর্ম পরিবর্তন না করলেও খ্রীস্ট ধর্মের প্রতি তার কোন আগ্রহই ছিল না। প্রতারণার সেই কৌশল নয়া ফর্মে এখন চালু করেছে বিশেষ শ্রেণীর এনজিওগুলো। বিশ্বব্যাপী রহস্যাবৃত এনজিও জগৎ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ-এর সাবেক মহাপরিচালক বিগ্রেডিয়ার (অবঃ) আব্দুল হাফিজ লিখেছেন, '৯২ সালে অসলোয় এক সেমিনারে যোগ দিয়েছিলাম। সেমিনারে মুল বক্তব্যে সুইডেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এনডার্স নর্মান কয়েকটি চমকপ্রদ বিষয় তুলে ধরেন। প্রধানতঃ পশ্চিমা শ্রোতা দর্শকদের সামনে

www.pathagar.com

তিনি শিল্পোন্নত প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাসকারী বিশ্বের বিশ শতাংশ লোক কিভাবে বিশ্বের মোট সম্পদের আশি ভাগ কুক্ষিগত করে তা মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেন। চাতুর্য আর সরলতার মিশেল দিয়ে তিনি বলেন, মানব জাতির কর্পোরেট অস্তিত্ব সচল রাখতে এ গ্রহের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম অবস্থায় বেঁচে থাকার স্বার্থে উত্তরের ধনী দেশগুলোতে তাদের উদ্বৃত্ত সম্পদের কিছু অংশ গরীবদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাওয়ানো হচ্ছে বিশ্বব্যাপী এনজিও'র বিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এবং তা হচ্ছে মূলতঃ ধনী উত্তরের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে। তবে এনজি'র মাধ্যমে এসব ছিটেফোঁটা সম্পদ একেবারেই বিনামূল্যে দেয়া হয় না। জনাব হাফিজ লিখেছেন, ইতিহাসের সর্বপর্যায়েই দেখা যায় একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু প্রভাবশালী শ্রেণী সব সময় একচেটিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি, লাভ ও সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখতে অগণিত সামাজিক ইনস্টিটিউশনের আকারে তাদের বিভিন্ন এজেন্সীর ওপর নির্ভরশীল। বিধ্যমান এ ধারায় এনজিও হল আরেকটি নতুন সামাজিক ইনস্টিটিউশন, সাম্প্রতিক দশকগুলোর বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধোত্তরকালে যার উত্থান ঘটেছে ব্যাপক হারে। তারা তাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষকদের স্বার্থরক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও কৌশল এবং আদর্শগত দিকে থেকে একটি রহস্যময় আচরণের ধারা বজায় রাখে।

বর্তমান ধারার এনজিও বাংলাদেশের কাজ শুরু করে সত্তর দশকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের নিরীহ ছিন্নমূল মানুষের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী নিয়ে এনজিওরা '৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম বাংলাদেশে আসে। ৭০-৮০এর দশকের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবার-পরিকল্পনা, পুরনো রাস্ত -ঘাট সংস্কার প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়নের কার্যক্রম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ছোটখাটো স্কুল-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রামে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষায় শিক্ষিত করার কর্মসূচী পর্যন্ত এনজিওদের বিভিন্নমুখী সমাজসেবামূলক কার্যাবলী বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময় তাদের গ্রামীণ ব্যাংক মারফত মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচারিত সাফল্য অনেককে সম্মোহিত করে ফেলে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এস দেখা যায় সার্ভিস সেক্টরসহ বড় বড় শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের দিকে তাদের পুঁজি দ্রুতগতিতে ধাবিত হচ্ছে। তাছাড়া ব্যাংকিং, ভূমি সংস্কার, বড় বড় সংস্থা প্রকল্প প্রভৃতিতে রাষ্টীয় নীতিনির্ধারণী কমিটিতে এনজিও প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি এখন আপত্তিকর পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। অন্যদিকে এনজিওদের কথিত দারিদ্র্য বিমোচন ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে নানা দিক থেকে। তাদের সফলতার সস্তা বুলি কার্যতঃ

www.pathagar.com

মানুষের কোন কাজে আসছে না তার প্রধান কারণ মহাজনী দৃষ্টিভঙ্গি। এনজিওদের কার্যক্রম সম্পর্কে বিআইডিএস'র এক গবেষণায় বলা হয়েছে, দারিদ্র দূরীকরণে এনজিও ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচীর ভূমিকা খুবই নগণ্য। অনদিকে ব্যবসায়ীরা বলছেন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এনজিওরা রোগের সমতুল্য। কারণ, তারা বিনা সুদে টাকা এনে বিনা ট্যাক্সে ব্যবসআ-বাণিজ্য করছে।

তাহলে সত্যিকার অর্থে এনজিওদের সফলতা কোথায়? এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ক্ষমতার কোটারী এবং রাজনীতিতে তাদের সদর্প পদচারণাই প্রধান সফলতা। আইন বে-আইনের নানা অলিগলিতে দেশব্যাপী এক শ্রেণীর এনজিও নেটওয়ার্কের বিস্তৃত জাল এখন দেশের ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। বাংলাদেশের চলমান রাজনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সাবেক সামরিক শাসক এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে যেসব এনজিওরা হাঁটি হাঁটি, পা পা করে সমাজ কর্তৃত্বে তাদের অবস্থান গ্রহণ করছিল তারা সক্রিয় হয়ে বর্তমান আমলে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। সরকারী সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এনজিওদের সাথে সরকারের সম্পর্ক কি ? কাঠামোগত বিশ্লেশণ করলে এ সাযুজ্য হয়ত চোখে পড়বে না। কারণ, এনজিওতে কাজ করেন প্রধানত এক সময়কার হতাশ বাম রাজনীতি ও সাধারণ পর্যায় থেকে উঠে আসা এক শ্রেণীর নারী ও যুবকরা। মজার ব্যাপার অনেক এনজিওতে এমন অনেক বাম নেতারা রয়েছেন যারা এক সময়ে আওয়ামী শাসনের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছেন। তাহলে শুধু কি অর্থের প্রয়োজনেই তারা আপোষ করেছেন- নাকি অন্য কিছু। এই অন্য কিছুর মাহাত্ম্য খুঁজতে গেলে এনজিওদের দর্শনে পৌঁছতে হবে। যত কথাই তারা বলুক না কেন বিশেষ শ্রেণীর এনজিওদের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে মুসলমানিত্ব ধ্বংস করা। । খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ যা-ই বানানো হোক বা না হোক বড় কথা হল ইসলামবিদ্বেষী করে তোলা। গত চার দশকের কাজ পর্যালোচনা করলে এই ধরনের হাজার হাজার উদাহরণ পাওয়া যাবে সেখানে শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে চাকরি হারাতে হয়েছে এবং ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণ করতে গিয়ে ধর্ষিত হতে হয়েছে এবং সুদ দিতে না পারায় গৃহহীন হতে হয়েছে অনেক সাধারণ মহিলাদের। মূল্যবোধ ধ্বংসের উদাহরণ হিসেবে থাইল্যান্ডকে গ্রহণ করা যেতে পারে। সেখানে এক সময় জাতীয় উন্নয়নের নামে সামাজিক ব্যভিচার চালু করা হলে থাইল্যান্ডের জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেছিল। কিন্তু তারা ব্যর্থ

www.pathagar.com

হয়েছেন। আজ থাইল্যান্ড, ব্যাংকক এইড্‌সে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এই মূল্যবোধ ধ্বংস প্রক্রিয়ার সাথে আধিপত্যবাদীদের আঁতাত।

ইদানীংকালে কথায় কথায় সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজছেন অনেকেই। তারা যদি প্রতিবেশী ভারতের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন হিন্দুত্বই তাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রতীক। যদি বৃটেনের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন, রাষ্ট্র খ্রীষ্টানিটিকে সংরক্ষণ করছে। এ সমস্ত উন্নত দেশগুলোতে ইসলাম বা মুসলমানদের ভাল চোখে দেখা হয় না। সেখানে কোন কোন দেশে কোন একজন স্কুল ছাত্রী হিজাব পরলে তাকে বহিষ্কার করা হয়। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা দেশে কোর্ট থেকে সুয়োমোটো রায়ে ফতোয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়। এনজিও নামক ধর্মদ্রোহীরা আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে লেগে যায়। অথচ এই বাস্তবতা প্রায় সবাই ভুলে যেতে বসেছেন যে, প্রধানত ইসলাম ধর্মই বাংলাদেশকে এ অঞ্চলে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে এবং এই পার্থক্য রেখা মুছে ফেলা সম্ভব হলে আধিপত্যবাদের সাথে মিলে যাওয়া সম্ভব। কল্পিত পাকিস্তানপ্রীতির ধুয়া তুলে ইসলামী চিন্তাবিদদের উপর আক্রমণ করছে। আধিপত্যবাদীদের দোসর এবং তাদের অর্থ ও সহায়তায় পরিচালিত পত্র-পত্রিকা ও সংগঠনগুলো একইভাবে আক্রমণ পরিচালনা করছে। ঐ বিশেষ শ্রেণীর এনজিওসমূহ ক. গণতন্ত্র খ. মানবাধিকার, গ. সংবিধানের দোহাই, ঘ. প্রগতির নামে প্রকৃতপক্ষে মদ ও ব্যভিচারের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টিরই চেষ্টা করছে। সমাজ জীবনে তাদের এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই আগামী নির্বাচনে ইস্যু হিসাবে গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু তা না করে তারা আগেভাগেই সমাজ বিভাজনে নেমে পড়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে চারদলীয় জোট তথা দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির উপর দায়িত্ব এসে পড়েছে তিন অপশক্তি রুখে দেবার। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্তরায় উল্লেখিত তিন শক্তিবিরোধী কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

লেখক ঃ সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা।

www.pathagar.com

বিভাজনের রাজনীতি, ফতোয়া ও এনজিও

অধ্যাপক (ড.) নজরুল ইসলাম

একটি দেশের জনগোষ্ঠীকে পরস্পর বিরোধী, প্রতিদ্বন্দ্বী দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে সেই দেশকে কখনই উন্নয়নের দিকে অগ্রসর করানো যায় না। বাংলাদেশ একটি দরিদ্র্যপীড়িত দেশ হলেও এই দেশটিকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা বড় সুবিধা ছিল এই যে, এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মোটামুটি একই ধরনের সংস্কৃতির ধারক। ভাষাগত ও কৃষ্টিগত দিক থেকে বিশ্বের অনেক দেশের মত বাংলাদেশের সমাজ বিভাজিত নয়, এসব বিবেচনা করে বাংলাদেশকে একটি homogenous society বলা যেতে পারে। দেশ পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এই সুবিধাটি কাজে লাগিয়ে দেশকে সামনের দিকে নিতে পারতেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃজনক হলেও সত্য যে, এ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ও সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য এলিট সম্প্রদায় বাংলাদেশের সমাজে ঐক্যবদ্ধ না করে সমাজকে নানামুখী পরস্পরবিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীতে বিভাজিত করে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন যে, বাংলাদেশের রাষ্টযন্ত্র ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে একটি Collapse State বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

একটি বিভাজিত জনগোষ্ঠী নিয়ে যে দেশকে সামনের দিকে অগ্রসর করানো যায় না তা বোধ হয় অনুভব করতে পেরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সদ্য স্বাধীন দেশকে সামনের দিকে অগ্রসর করানোর জন্য সমাজ জীবনের বিভাজন দূর করার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বিভিন্ন সময় প্রকাশ করেছিলেন এবং এই লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় কতটুকু সফল হয়েছিলেন বা কেনই-বা ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের মতো দুঃখজনক ঘটনা ঘটল, সে বিষয়ে অনেক কথা ও ব্যাখ্যা থাকলেও সমগ্র ঘটনাবলীকে সরল ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যাবে না। অনেক জটিল ঘটনাবলীই ১৫ আগস্ট সংঘটিত ঘটনার অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে। এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা জন্য সরল ব্যাখ্যা দিয়ে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভবতঃ সমগ্র ঘটনাবলীর জটিল অনুঘটকগুলো খুঁজতে গেলে এমন সব সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে, যা অনেককেই বিব্রত করবে। সে কারণেই ১৯৭২-৭৫ পর্বকে সবাই যার যার মতো করে সরল সমীকরণে প্রকাশ করতে আগ্রহী। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পর এসে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক মহল ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের কোন কোন গোষ্ঠী এমন সব কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েছেন, যা

www.pathagar.com

সমাজকে ঐক্যবদ্ধ না করে সমাজকে আরও বিভাজিত করছে এবং এর ফলশ্রুতিতে সমাজে হানাহানি, রক্তক্ষয় ও নানাবিধ সন্ত্রাসী ঘটনা বেড়েই চলছে। এর শেষ কোথায়, দেশটি কোনদিকে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে বা সামনের দিনগুলো কি নিয়ে অপেক্ষা করছে, সে সম্পর্কে কোন অনুমান করাও কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে কোন কোন মহলের ভূমিকা নিয়ে কথা উঠবেই এবং সেই ভূমিকা বারবার বাংলাদেশের রাজনীতিতে উচ্চারিত হবেই। যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তাদের বিরোধিতা করা এবং আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করা মানেই স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী শক্তি- এটা কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি হতে পারে না। ১৯৭১-এর বিভাজনকে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার নতুন বিন্যাসে বিভাজিত করে দেশের জনসমষ্টিকে পরস্পরবিরোধী প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আজকে এটা দিবালোকের মতো সত্য যে, ১৯৭১-এর স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তি, আর স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধারাও যদি আওয়ামী লীগের বিপক্ষে কথা বলে তারা হয়ে যায় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। আজকে আওয়ামী লীগের পক্ষে যে গোষ্ঠীটি স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের শ্লোগান দিয়ে সমাজকে বিভাজিত করে ফায়দা লুটছে, তাদের অনেকেই ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন না। পাকিস্তানী স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতাকর্মী যখন আইয়ূবের কারাগারে জীবনপাত করছেন, সেই সময় অনেক চৌধুরী আইয়ুব-মোনায়েমের মোসাহেবী করে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে সরকারী বড় বড় পদ বাগিয়ে টিক্কা খানের কাছে শপথ নিয়ে বিচারপতি হয়ে আজ তারা হয়ে গেছেন মুক্তিযুদ্ধের বড় শক্তি। এরা নতুন নতুন বক্তব্য দিয়ে সমাজকে বিভাজিত করে দেশের বারোটা বাজাচ্ছেন।

সমাজকে বিভাজিত করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে এরা ব্যবহার করছে রাষ্ট্রীয় শক্তিকে। তার বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং কখনও কখনও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাধারণ সদস্য। একজন পুলিশকে কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর হাতে জীবন দিতে হবে- এটা কেউ সমর্থন করবে না এবং এ ধরনের হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের দাবী করবে সবাই। কিন্তু একই সাথে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, বিভাজনের রাজনীতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রশক্তির নির্দেশে পুলিশ কতো মানুষকে পিটিয়ে মেরেছে, পঙ্গু করেছে– তার হিসাব বা বিচার কে করবে। মানুষকে নিরাপত্তা দিতে ব্যবহার করছে, নাকি

www.pathagar.com

রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন থাকার জন্য বিরোধী দল ও মতকে দমন করার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করছে। বছরখানেক পূর্বে ঢাকার এক মসজিদে বাদশা মিয়া নামে যে পুলিশ সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হল, তার জন্য দায়ী কে ? ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় পুলিশ-বিডিআর-এর গুলিতে যে ৭ জন মানুষ মারা গেল তার জন্য কারা দায়ী, এনজিওর বিরোধীতা করতে গিয়ে যে এনজিও অফিসগুলো পুড়িয়ে দেয়া হল তার জন্য দায়ী কে ? পুলিশ হত্যাকারীরা, নাকি যে সরকার পুলিশকে দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে তৎপর সেই সরকার, না যেসব এনজিও নিজস্ব স্বার্থে সমাজকে অস্থির করতে চাইছে তারা।

দেশের মানুষের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার জন্য রাষ্ট্র যখন সর্বদাই পুলিশকে ব্যবহার করে, তখন রাষ্ট্র কেমন করে প্রত্যাশা করবে যে, রাষ্ট্রের সকল নাগরিক আইন মেনে চলবে। রাষ্ট্র যখন পুলিশকে লেলিয়ে দেয় মানুষকে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করতে, সেখানে মানুষ আর কতদিন মুখ বুঝে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নকে সত্য করবে। শান্তিপূর্ণ মিছিলে সরকারী নির্দেশে যখন পুলিশ লাঠি, বন্দুক, টিয়ারগ্যাস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সরকার যখন পুলিশকে আইনবিরোধী, সংবিধানবিরোধী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেয়, তখন মানুষের আক্রোশের শিকার হয় বাদশা মিয়ার মতো নিরীহ পুলিশ সদস্যরা। রাষ্ট্র যখন পুলিশকে ব্যবহার করে সন্ত্রাসী গডফাদারদের মদদ দিতে ও সাধারণ মানুষকে নিগৃহীত করতে তখন রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের ক্ষোভের শিকার হয় নিরীহ পুলিশ বাহিনীর সদস্য বাদশা মিয়ারা। পুলিশ সদস্য বাদশা মিয়াকে যারা খুন করেছে তাদের খুঁজে বের করে বিচার করা যেমন জরুরী, একইভাবে খুঁজে বের করা দরকার কাদের নির্দেশে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের ওপর, সাধারণ মানুষকে গুলী করে, পিটিয়ে হত্যা করে, পঙ্গু করে। তবে সব অপকর্মের দোষ পুলিশের নয়। দোষ তাদের, যারা পুলিশকে ব্যবহার করছে নিজেদের গদি রক্ষার স্বার্থে, সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজস্ব ভাগ্য গড়ার কাজে।

নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে সমাজকে বিভাজন করে ফায়দা হাসিলে রাষ্ট্রশক্তির সাথে সংযুক্ত হয়েছে অপর একটি শক্তি- এরা এনজিওগোষ্ঠী। সমাজ পরিবর্তনের বক্তব্য রেখে, সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে এদের কাজ করার কথা থাকলেও এরা নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে। তবে এনজিওগোষ্ঠী রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেদের জড়িয়ে নিজেদের মৃত্যুঘন্টা যে বাজিয়েছে তা অনুভব করতে বেশীদিন সময় লাগবে না। বাংলাদেশে বিশ হাজারের মতো এনজিও কাজ করলেও সামাজিক পরিবর্তনে ও সমাজের পিছিয়ে

www.pathagar.com

পড়া মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে- এই ধরনের এনজিওর সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকটি। বেশীরভাগ এনজিও গরীব মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের কথা বলে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা আনলেও সেই টাকা তারা ব্যবহার করছে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে। যে এনজিও মালিক ২-৩ হাজার টাকা বেতনে চাকরির যোগ্যতা রাখে না, সে এনজিও মালিক হিসাবে লাখ লাখ টাকা বেতন ও অন্যান্য সুবিধা নিচ্ছে। একাধিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী হাঁকাচ্ছে নিজেদের জন্য, পরিবারের সদস্যদের জন্য। বসবাস করছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রাসাদোপম বাড়ীতে, ছেলে-মেয়েদের বিদেশে পড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে নিজেরা বের হচ্ছে বিশ্বব্যাপী প্রমোদ ভবনে। এনজিও মহাজনরা এসব কিছুই করছে দেশের গরীব মানুষকে সাহায্য করার নামে। আড়ালে-আবডালে এনজিও মহাজনরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে এখন নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে। লক্ষ্য একটাই, যাতে রাষ্ট্র কোনদিন তাদের অপকর্মের বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। আমার মতে, এনজিও গোষ্ঠীর যেসব উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি রাজনৈতিক খেলায় মেতে উঠেছেন, তারা নিজেদের ভবিষ্যৎকে নিজেরাই অন্ধকারে ডুবিয়েছেন।

মনোবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে যেটুকু বুঝি, তাহল কোন সমাজকে পরিবর্তন করতে চাইলে বাইরে থেকে কোন কিছু চাপিয়ে দিয়ে এই পরিবর্তন আনা যায় না। একটি সমাজ ও সংস্কৃতির আনয়ন করতে হলে সেই সমাজকে ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে। মানুষের বিশ্বাস, মনোভাব, মুল্যবোধকে সম্মান দেখিয়ে মানুষের মনোজগতে পরিবর্তন এনে মানুষকে সংস্কারের পথে নিয়ে যেতে হবে। পরিবর্তনে বাধা আসলে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের পথ পরিহার করে মানুষের সামাজিক, ব্যক্তিগত ধর্মীয় চাহিদা ও তাদের মূল্যবোধগুলো অনুধাবন করে সামাজিক বৈপরীত্যগুলো যুক্তি ও সহনশীলতার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস মনোভাবের বিষয় নয়, ধর্মীয় অনুশাসনগুলো গভীর মূল্যবোধের বিষয়। মনোবিজ্ঞানীগণ মূল্যবোধের ওপর পরিচালিত গবেষণার ফলাফল আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, মানুষের মনোভাব পরিবর্তন করা গেলেও মূল্যবোধের পরিবর্তন করা কঠিন এবং যেসব মূল্যবোধ চেতনার গভীরে প্রোথিত, সেসব মূল্যবোধের ওপর আঘাত আসলে মানুষ জীবন দিয়ে তা প্রতিহত করে।

কিন্তু বাংলাদেশে একশ্রেণীর এনজিও এর বিপরীত পথে অগ্রসর হচ্ছে। অবশ্য এতে হয়ত তাদের স্বার্থ থাকতে পারে এবং অবশ্যই রয়েছে। এসব এনজিও নিজ স্বার্থেই সমাজকে বিভাজন করার চেষ্টা করছে এবং দেশ শাসকেরা বুঝে বা না

www.pathagar.com

বুঝে এনজিওদের ফাঁদে পা দিয়ে সমাজ বিভাজন প্রক্রিয়াকে তীব্রতর করছে। কোন কোন এনজিও সমাজকে ধর্ম ও মৌলবাদিতার নামে বিভাজন করে, সেই বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে বিদেশ থেকে আরও বেশী ফান্ড জোগাড় করার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

এনজিওদের বিভাজনের নীতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে তাদের সাম্প্রতিক কর্মকান্ডে। বিশেষ করে প্রশিকা নামের এনজিও মালিক কাজী ফারুক, 'নিজেরা করি'র খুশী কবির ও এডাবের কতিপয় নেতৃবৃন্দের হঠকারী কর্মকান্ডে। ফতোয়াকে কেন্দ্র করে এনজিও ও দেশের আলেম-মাশায়েখ সম্প্রদায় যেভাবে মুখোমুখি দাঁড়য়েছে, তা দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে ভাবতেই ভয় লাগে। এনজিও ও আলেম-মাশায়েখ গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তা সহজে থামবে না। এই যুদ্ধে এনজিও জিতবে, না হয় আলেম-মাশায়েখ জিতবে, এমন একটি মুখোমুখি অবস্থানে এরা দাঁড়িয়েছে এবং এই দ্বন্দ্বে বিগত সরকার এনজিওদের পক্ষ নিয়ে সমস্যাকে আরও জটিল করে ফেলেছে।

বাংলাদেশের মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতিতে এনজিওদের ভূমিকা কিছুটা পরিলক্ষিত হলেও তাদের অবস্থানের কোন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ভিত্তি নেই। যেমন এনজিওতে যারা চাকরি করে তারা বেতনভুক্ত কর্মচারী। এদের বেশীরভাগ নিজেদের চাকরি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এনজিওদের পক্ষে ভূমিকা রাখে। এনজিওরা কোন সমাবেশ করতে চাইলে টাকা দিয়ে ও অন্যান্য সুবিধা দিয়ে বা বাধ্যতামূলকভাবে সমাবেশে লোক হাজির করাতে হয়। অথচ যেসব প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি রয়েছে তাদের সমাবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। বড় বড় রাজনৈতিক দলের সমাবেশ ছাড়াও সারাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ওয়াজ মাহফিল, ইসলামী জল্সা, ইজতেমাসমূহে হাজার হাজার লোকের স্বতঃস্ফূর্ত আগমন প্রমাণ করে এসব প্রতিষ্ঠানের সামাজিক ভিত্তি কত শক্তিশালী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায়, এনজিওরা নিজেদের প্রচন্ড শক্তিশালী মনে করলেও এদের শক্তির সামাজিক ভিত নেই। কিন্তু এরা বিষয়টা অনুধাবন করতে পারছে না। তবে কাজী ফারুক গং যে পথে অগ্রসর হচ্ছেন তাতে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিহীনতার প্রমাণ পেতে বোধহয় আর বেশী দিন অপেক্ষা করতে হবে না। শত শত বছরব্যাপী টিকে থাকা সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনগুলো গায়ের জোরে কয়েকটি এনজিও সরকারের পুলিশের জোরে বদলিয়ে ফেলবে, যা এক অসম্ভব সামাজিক প্রপঞ্চ। আজকে যদি এনজিওদের পুলিশ পাহারা না দেয় এবং এই দুই

www.pathagar.com

শক্তি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হয় তাহলে সামাজিক বাস্তবতা এই যে, এনজিও গোষ্ঠী নিমিষে উৎখাত হয়ে যাবে। এটা পক্ষ-বিপক্ষের কথা নয়, এটা বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক বাস্তবতা। যাদেরকে এনজিও গোষ্ঠী নিজেদের শক্তির ভিত্তি হিসেবে মনে করছে (এনজিও সুবিধাভোগী), তাদের আনুগত্য যে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ ও কৃষ্টির প্রতি তা এনজিওরা বুঝতে পারছে না। কয়েকশ' টাকা ধার দিয়ে মানুষের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, মূল্যবোধকে কখনই প্রভাবিত করা যায় না। মানুষকে মেরে ফেলা যেতে পারে কিন্তু মানুষকে তার মূল্যবোধের বিপরীতে কোন কাজ করতে বাধ্য করা যায় না। সুতরাং দেশের জনগণের সমর্থন ছাড়া পুলিশ ও কিছু ভাড়াটিয়া লোক দিয়ে যে সমাজের কৃষ্টি ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে এনজিও গোষ্ঠী যে পরাজিত হতে বাধ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর পুলিশ কোন প্রতিষ্ঠানকে চিরদিন বা অনন্ত সময় পাহারা দিয়ে রাখতে পারে না।

তবে আমার ধারণায় ফতোয়াকে (ফতোয়া ও ফতোয়াবাজি এক জিনিস নয়) কেন্দ্র করে এনজিও গোষ্ঠী যে লক্ষ্যে আলেম-মাশায়েখদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, তাতে আপাতত এনজিও গোষ্ঠী তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে। মানুষের অবস্থাগত পরিবর্তনে কোটি কোটি টাকা বিদেশ থেকে আনলেও এনজিও গোষ্ঠী সেই টাকার সিংহভাগ নিজেরা আত্মসাৎ করে, সমাজের মানুষের তেমন পরিবর্তন না হওয়ায় বিদেশী সাহায্যদাতারা এসব ক্ষেত্রে টাকা দেয়া কমিয়ে দিয়েছে। এখন বিদেশ থেকে টাকা আনার জন্য প্রয়োজন নতুন ক্ষেত্র। ফতোয়াকে কেন্দ্র করে এনজিও গোষ্ঠীর বর্তমান কার্যকলাপ সেই লক্ষ্যেই পরিচালিত। এনজিও গোষ্ঠী যদি দেখাতে পারে তারা ইসলামী মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাহলে বিদেশী ফান্ডের কোন অভাব থাকবে না। কারণ সেসব ফান্ড নিয়ন্ত্রণ করে খ্রীস্টান-ইহুদী লবি ও তাদের শাসিত রাষ্ট্র, যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে এবং মুসলমানদের ধ্বংস করা এরা ক্রুসেডের অংশ মনে করে। এনজিও মালিকরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে দেশে শুরু করেছে বিভাজনের রাজনীতি এবং এই বিভাজনের রাজনীতির বলি হচ্ছে বাদশা মিয়ারা ও মাদ্রাসার নিরীহ ছাত্রসহ সাধারণ মানুষ। কিন্তু এর শেষ কোথায়।

লেখকঃ প্রফেসর, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সৌজন্যঃ দৈনিক ইনকিলাব

www.pathagar.com

এনজিও সম্রাটদের অবাধ অস্বচ্ছতা

কবির এন. খান

বাংলাদেশে সক্রিয় বিভিন্ন ধরনের এনজিওর সংখ্যা ছোট, বড়, মাঝারি মিলেয়ে প্রায় দেড় হাজার। ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে দেশটির স্বাধীন উত্থানের সমসাময়িক কালেই এ দেশে এনজিও কার্যক্রম শুরু হয় সেই থেকে আজ পর্যন্ত বহু উন্নয়নমূলক সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি, সরকারেরই উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে, এনজিওগুলো নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করে এসেছে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এনজিওগুলো দারিদ্র দূরীকরণ, শিক্ষার প্রসার, নানান সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিষয়ে মানবাধিকার সংক্রান্ত গণসচেতনা বৃদ্ধি ইত্যাদি কাজে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এনজিওদের একটি বিরাট অংশ, বিশেষত বড় বড় সংগঠনগুলো, নানান ধরনের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে - যার মধ্যে প্রধান হলো দরিদ্র-ভূমিহীনদের মধ্যে চড়া সুদে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ

বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রমে এই এনজিওদের নানান সাফল্যের কথা শোনা যায়। কিছু ক্ষেত্রে তাদের দাবি বস্তুনিষ্ঠও বটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা নিজেরাই বহু অর্থ ব্যয় করে ঢাকঢোল পিটিয়ে নিজেদের সাফল্য প্রচার করে থাকে। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে, যে পরিমাণ সাফল্য অর্জিত হয়, এনজিওগুলো সমপরিমাণ অর্থ ব্যয়ে একই পরিমাণ সাফল্য অর্জন করতে পারছে কি না, এই বিষয়ে কোন বস্তুনিষ্ঠ সামগ্রিক গবেষণা এখনো পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি। অথচ বিতর্কটির নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন।

এ দেশে এনজিও কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজনৈতিক বিতর্কও। ১৯৭০-এর দশকের একটি বিরাট পর্ব জুড়ে যখন এ দেশে বামপন্থী রাজনীতির এক ধরনের প্রতাপ ছিল তখন বলা হতো যে, ইউরোপ এবং আমেরিকার পুজিওয়ালা শ্রেণী তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে এনজিওর মাধ্যমে টাকা ঢালছে এই সব দেশের সমাজ বদলের আন্দোলনকে বিনাশ, নিদেনপক্ষে ভোতা করে দেয়ার জন্য। ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে এ দেশের বামপন্থী রাজনীতি রীতিমতো দুর্বল হয়ে পড়ে, একেবারেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে তার পরিসর। এরপরও রাজনীতি সংক্রান্ত বিতর্ক থেকে অব্যাহতি পায়নি এনজিও কার্যক্রম। কিছু বড় এনজিও এবার ভেতরে ভেতরে আওয়ামী লীগের পক্ষে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। এ তৎপরতা প্রকাশ্যে রূপ নেয় মূলত ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রশিকাসহ

www.pathagar.com

কিছু বড় এনজিও-র অত্যন্ত স্থূলভাবে আওয়ামী লীগের পক্ষ অবলম্বনের ভেতর দিয়ে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর এরা আওয়ামী লীগের ফ্রন্টের মতো করেই নানান রাজনৈতিক ইস্যুতে, নানান অজুহাতে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে। ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে সাধারণ ভোটারদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি প্রকল্পের নামে প্রশিকার নেতৃত্বাধীন এনজিওগুলো খোলাখুলিভাবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের পক্ষ অবলম্বন করেছে বলে সুস্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়। কিন্তু এসব অভিযোগের পরোয়া করেনি এরা। একবারও ভেবে দেখেনি যে, এ দেশের গরীব মানুষের অশিক্ষা-অস্বাস্থ্য ও দারিদ্রমোচনের জন্য বিদেশ থেকে আসা হাজার হাজার কোটি টাকার সাহায্য পছন্দসই রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা আরোহণের পথ সুগম করার কাজে ব্যয় করা অন্যায়। তবে সমাজের নানান স্তরে এসব বিষয় বরাবরই আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে এখনো।

অন্যদিকে এনজিও সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর নেতা-নেত্রীর ব্যক্তিগত বিত্ত ও বৈভবের জৌলুস নিয়ে এবং ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা-খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এসব নেতা-নেত্রীর ব্যক্তিগত সম্পদের ফুলে ফেপে ওঠা নিয়েও নানান রকম আলোচনা-সমালোচনা হয়ে আসছে সমাজের ভেতর্। এসব এনজিও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের নানান বিভাগের বিভিন্ন কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত নসিহত করে। কিন্তু তাদেরই কর্মকান্ডের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে সমাজে নিরন্তর যে প্রশ্নের অবতারণা হয়ে চলেছে, সে সম্পর্কে নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন তারা বোধ করে না। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো এবং বিদেশী সাহায্য দাতাদের স্থানীয় কর্মকর্তারাও এ বিষয়ে এক রহস্যজনক নীরবতা পালন করেন। অভিযোগ আছে, এসব দেশি-বিদেশী কর্মকর্তাদের একটি বড় অংশ স্থানীয় এনজিও কর্ণধারদের নানানমুখী দুর্নীতির বেনিফিশিয়ারি। অবশ্য অতি সম্প্রতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তত্ত্বাবধানে একদল কর কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিকার নেতৃত্বাধীন কয়েকটি এনজিওপ্রধানের ব্যক্তিগত দুর্নীতির কিছু অংশ হলেও আবিষ্কার করার উদ্যোগ নিয়েছন। কয়েকটি উড়ো চিঠির ভিত্তিতে রাজস্ব বোর্ড পাঁচজন এনজিওপ্রধানের ব্যক্তিগত আয় ও তাদের দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন পরীক্ষা করতে গেলে, অতি-অল্প-আয়াসেই, আবিস্কৃত হয় তাদের বিপুল পরিমাণ কর ফাকির এক অস্বচ্ছ অধ্যায়। এসব এনজিও প্রধানরা হলেন-

- পৃপ ট্রাস্টের অ্যারোমা দত্ত
- নারী প্রগতি সংঘের রোকেয়া কবীর

www.pathagar.com

- সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (সিডিএস)-এর ওমর ফারুক চৌধুরী
- ইন্টারন্যঅশনাল ভলান্টারি সার্ভিসেস (আইভিএস)-এর স্থানীয় প্রধান আব্দুল মতিন। এবং তাদের সকলের সর্দার
- প্রশিকার কাজী ফারুক আহমেদ।

রাজস্ব বোর্ডের অনুসন্ধানে দেখা যায়, অ্যারোমা দত্ত গত ছয়টি অর্থ বছরে বিপুল পরিমাণ ব্যক্তিগত আয়কর ফাকি দিয়েছেন। প্রতি বছর তিনি যে আয়কর রিটার্ন জমা দিয়েছেন তাতে তার ব্যক্তিগত প্রকৃত আয়ের একটি বিরাট অংক গোপন করেছেন। অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে যে, অ্যারোমা দত্ত বেতন-ভাতা হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ গত ছয় বছরে তার এনজিও থেকে নিয়েছেন, আইন অনুযায়ী তার ওপর আয়কর দাড়ায় প্রায় ২৮ লাখ টাকা। কিন্তু ছয় বছরে তিনি আয়কর পরিশোধ করেছেন মাত্র ২.৫ লাখ টাকা। এটা তিনি করেছিলেন বেতন-ভাতার সিংহভাগ লুকিয়ে রেখে, আয়কর বিভাগের কাছে আয়ের প্রকৃত হিসাব পেশ না করে। যার বেতন-ভাতার ওপর ছয় বছরে শুধু আইনানুগ আয়করের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮ লাখ টাকা, তার গৃহীত বেতন-ভাতার পরিমাণটা সহজেই অনুমেয়। দেশের দারিদ্র ও পশ্চাদপদতার পরিসংখ্যান এই সব এনজিওজীবীদের বিত্তবান হয়ে ওঠার জন্য বড় কাচামাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন

রাজস্ব বিভাগের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসা এই বিপুল পরিমাণ আয় ও তার ওপর আরোপিত আইনানুগ করের পরিমাণের সিংহ ভাগ ইতোমধ্যেই কবুল করে নিয়েছেন অ্যারোমা দত্ত। তিনি ১৫ লাখ টাকার একটি রিভাইজড রিটার্ন সরকারের তহবিলে মধ্য এপ্রিলে জমা করে দিয়েছেন। পাশাপাশি চলছে তার আয়কর সংক্রান্ত শুনানি। ইতোমধ্যে কর কর্মকর্তারা প্রকৃত আয় লুকানোর আইনানুগ শাস্তি হিসেবে অ্যারোমার কাছ থেকে আদায় যোগ্য অর্থের অংকটাও নিরুপণ করে রেখেছেন, যার পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা।

রোকেয়া কবীরের কেসও অনুরূপ। রাজস্ব বিভাগের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গত ছয় অর্থ বছরে তার প্রকৃত আয়ের ওপর কর পরিশোধ করার কথা প্রায় ১০ লাখ টাকা। কিন্তু তিনি রাজকোষে জমা দিয়েছেন মাত্র দুই লাখ টাকার কিছু বেশি। তার প্রকৃত আয় লুকানোর ফলে আইনানুগ সম্ভাব্য জরিমানার পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে ৩৭ লাখ টাকার মতো। রাজস্ব বিভাগের শুনানিতে তিনি অবশ্য এর পুরোপুরি দায় এখনো স্বীকার করেননি। তবে আংশিক দায় মাথায় নিয়ে ইতোমধ্যে ৭৮ হাজার টাকার একটি রিভাইজড রিটার্ন জমা দিয়েছেন। এই নতুন করে রিটার্ন জমা দেয়ার সময়ও তিনি একটি স্থানীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গত

www.pathagar.com

বছরে জমাকৃত প্রায় ৭০ লাখ টাকার উল্লেখ করেননি, এই টাকার উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান তো পরের কথা।

ওমর ফারুক চৌধুরী গত ছয় অর্থ বছরে আয়কর জমা দিয়েছেন প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকা। কিন্তু রাজস্ব বিভাগের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তার ব্যক্তিগত সম্পদের হিসেবে তার কাছ থেকে পাওনা করের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় সাত লাখ টাকা। অন্যদিকে প্রকৃত আয় লুকানোর জন্য কর কর্মকর্তারা যে আইনানুগ জরিমানা তার কাছ থেকে রাষ্ট্রের পাওনা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, তার পরিমাণ ৮ লাখ টাকারও বেশি। ওমর ফারুক অবশ্য কর কর্মকর্তাদের কাছে এখনো দাবি করছেন যে, তিনি কোন আয় লুকাননি। সংশ্লিষ্ট বিভাগ তাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছেন। এদের তথ্য চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে ওমর ফারুককে জরিমানাসহ মোট ১১ লাখ টাকা পরিশোধ করতে হবে। কর্মকর্তাদের নতুন অনুসন্ধানে ইতোমধ্যে শুনানির সময়ে প্রদত্ত তার কিছু জবানবন্দি অসত্য প্রমাণিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

আব্দুল মতিনের ক্ষেত্রে গত চার অর্থ বছরের হিসেব পুনঃপরীক্ষা করেছেন সংশ্লিষ্ট আয়কর কর্মকর্তারা। তাদের হিসেবে মতিনের আয়কর দেয়ার কথা ছিল তিন লাখ টাকার উপরে। কিন্তু তিনি পরিশোধ করেছেন মাত্র ৭১ হাজার টাকা। আয়কর ফাকি দিয়েছেন দুই লাখ টাকার কিছু বেশি। প্রকৃত আয় লুকানোর জন্য জরিমানাসহ তার কাছ থেকে মোট আদায়যোগ্য করের পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে ১১ লাখ টাকার কিছু উপরে। অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্বে মতিনও কোন আয়কর ফাকির কথা এখনো পর্যন্ত স্বীকার করেননি। তবে সংশ্লিষ্ট আয়রক কর্মকর্তারা মনে করেন, তাদের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত অপ্রামাণিত হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রশিকা প্রধান কাজী ফারুক আহমেদের কেসটি একটু ভিন্ন রকম, যদিও আয় লুকিয়ে কর ফাকি দেয়ার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তার বিরুদ্ধেও রয়েছে। খুলনার ফুলতলায় তার এক একরের বেশি জমি রয়েছে। জমিটি তিনি প্রশিকার স্থানীয় অফিসকে লিজ দিয়েছেন। কিন্তু লিজ থেকে প্রাপ্ত আয় কাজী সাহেব বেমালুম চেপে গেছেন আয়কর রিটার্ন জমা দেয়ার সময়। এছাড়া ১৯৯৮-১৯৯৯ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরের মধ্যে অভিযোগ রয়েছে, তিনি এক কোটি টাকারও বেশি ধার নিয়েছেন খোদ প্রশিকার কর্মচারীদের নামে সৃষ্ট বিভিন্ন তহবিল থেকে। এই বিপুল পরিমাণ টাকা তিনি ধার নিয়েছেন নিজ সন্তানদের বিদেশে লেখাপড়ার খরচ মেটাতে ও ঢাকায় একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্য। কর কর্মকর্তাদের অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে শুনানির সময়, কাজী ফারুক

www.pathagar.com

অবশ্য অতো টাকার দায় পুরো স্বীকার করেননি। তিনি দাবি করেছেন, তার সন্তানদের জন্য বিদেশে শিক্ষা খরচ বাবদ যে টাকা তিনি গ্রহণ করেছেন, তা এসেছে স্টাফদের চাঁদার টাকায় সৃষ্ট তাদের সন্তানদের জন্য তৈরি স্কলারশিপ ফান্ড থেকে। এছাড়া তিনি অ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্যও ধার নিয়েছেন অনুরুপভাবে সৃষ্ট স্টাফদের গৃহনির্মাণ ঋণ সংক্রান্ত একটি তহবিল থেকে।

তবে কর কর্মকর্তারা মনে করছেন, তিনি এ পর্যায়েও সত্য গোপন করে চলেছেন, বিশেষত গৃহীত ঋণের পরিমাণ নিয়ে। দ্বিতীয়ত, তারা অনুসন্ধান করে জেনেছেন, কর্মচারী-কর্মকর্তাদের যে সকল কল্যাণমূলক ফান্ডের কথা বলে কাজী সাহেব পার পাওয়ার চেষ্টা করছেন, সে সকল ফান্ডের একটা বড় অংশ জোগান দিয়েছেন প্রশিকাই। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কাজী ফারুকরা মাসে কতো টাকা বেতন হিসেবে গ্রহণ করেন? আর কতো বছর তিনি চাকরি করতে পারবেন? যে পরিমাণ টাকা তিনি ইতোমধ্যে ধার নিয়েছেন তা তিনি কিভাবে, কতোদিনে শোধ করবেন? সর্বোপরি দেশের নিঃস্ব ও গরীব মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের নামে বিদেশ থেকে সংগৃহীত অর্থ নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে, অ্যাপার্টমেন্ট ক্রয়ে এবং সন্তানদের আমেরিকায় লেখাপড়া খরচ মেটাতে ব্যবহার করা কতোটুকু নৈতিক?

অন্যদিকে, আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারাই বা কি করছেন? দেশের দারিদ্রের পরিসংখ্যান বিদেশে ফেরি কর এসব এনজিও কর্মকর্তারা অঢেল টাকা যোগাড় করেন, সে টাকা দিয়ে এ দেশে রাজনৈতিক দলবাজি করেন, যাপন করেন বিলাস বহুল জীবন, আর নিজেদের আয়-ব্যয়ের হিসাবে অস্বচ্ছ রেখে অন্যদের স্বচ্ছতার জন্য নিরন্তর নসিহত করেন। এদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এ দেশে জনগণের টাকায় পরিচালিত এনজিও ব্যুরোই বা করে কি? কিই-বা করে এনজিও ব্যুরোর তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়? তবে কি এই অভিযোগ সত্য যে, এ দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা, এনজিও কর্ণধার, ঢাকাস্থ সংশ্লিষ্ট বিদেশী কর্মকর্তা এবং প্রধান রাজনৈতিক দলের এক শ্রেণীর নেতার পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে এই দুষ্ট বলয় গড়ে উঠেছে? এই চক্রের প্রতারণার শিকার শুধু এ দেশের সাধারণ মানুষই নন, পশ্চিমের সেই সব সাধারণ মানুষও – যারা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নকামী অঞ্চলের গরীব মানুষকে সহযোগিতা করার মানবিক প্রেরণায় নিজেদের কষ্টার্জিত পয়সা বিতরণের জন্য তুলে দেন নিজ নিজ দেশের কর্মকর্তাদের হাতে।

এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। যেসব এনজিও কর্মকর্তার আয়কর ফাইল পুনঃপরীক্ষা শুরু হয়েছে, তাদের নানান সামাজিক সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে

www.pathagar.com

সহজেই বোঝা যায় যে, সরকার কিংবা সরকারের রাজস্ব বিভাগ একটি বিশেষ রাজনৈতিক ঘরানার লোকদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এনজিও পরিমন্ডলে এই ঘরানার পরিপন্থী যারা, তারাও ফেরেশতা নন। তাদের সম্পর্কেও সমাজে একই ধরনের আলোচনা-সমালোচনা জারি রয়েছে। তাদের বিষয়ে সরকারের যে কোন ধরনের উদাসীনতা রাজস্ব বিভাগের বর্তমান অনুসন্ধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে বাধ্য। সুতরাং সরকারের উচিত হবে একদেশদর্শিতার নীতি, যদি থাকে, তাহলে তা বাদ দিয়ে সমানভাবে এগোনো। পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখা যে, চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ এনজিও সম্রাটদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় সৎ ও প্রতিশ্রুতিশীল সংগঠনগুলো কর্মকান্ড যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

লেখক ঃ গবেষক ও সাংবাদিক

সৌজন্য ঃ যায় যায় দিন

www.pathagar.com

'র' -এর ভূমিকায় এনজিও

আবদুল আউয়াল ঠাকুর

মূলধারা '৭১-এর লেখক মইদুল হাসান তার বইয়ে বাংলাদেশ জন্মপূর্ব পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, ৫/৬ মার্চ শেখ মুজিবের নির্দেশে তাজউদ্দিন গোপনে দেখা করেন ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি কমিশনার কে সি সেন গুপ্তের সাথে। উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানী শাসকরা যদি সত্যি সত্যি পূর্ব বাংলায় ধ্বংস তান্ডব শুরু করে তবে সে অবস্থায় ভারত সরকার আক্রান্তকারীদের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান বা সম্ভাব্য প্রতিরোধ সংগ্রামে কোন সাহায্য-সহযোগিতা করবে কিনা জানতে চাওয়া। উত্তরের অন্বেষণে সেন গুপ্ত দিল্লী যান। সারা ভারত তখন সাধারণ নির্বাচন নিয়ে মত্ত। সেখানে সরকারী মনোভাব সংগ্রহ করে উঠতে তার বেশ ক'দিন লেগে যায় এবং ঢাকা ফেরার পর সেন গুপ্ত ১৭ মার্চ ভাসা ভাসাভাবে তাজউদ্দিনকে জানান যে, যদিও পাকিস্তানী আঘাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে ইসলামাবাদস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন তবু আঘাত যদি নিতান্তই আসে তবে ভারত আক্রান্ত মানুষের জন্য সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদান করবে। এই বৈঠকে স্থির হয় তাজউদ্দিন শেখ মুজিবের সাথে পরামর্শের পর সেন গুপ্তের সাথে আবার মিলিত হবেন এবং সম্ভবত তখন তাজউদ্দিন সর্বশেষ পরিস্থিতির আলোকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতার প্রকার ও ধরন সম্পর্কে নির্দিষ্ট আলোচনা চালাতে সক্ষম হবেন। ২৫ মার্চের ঘটনা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' -এর সাবেক পরিচালক কে এস সুব্রামানিয়া ও মোহাম্মদ আইয়ুব-এর যৌথ লিখিত দ্য লিবারেশন ওয়্যার বইয়ের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয় যে, ভারতের জন্য ২৫ মার্চ '৭১ এমন এক ঘটনা যা শতাব্দীতে আর ঘটেনি। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে মুজিব বাহিনীর সংগঠন ভারতীয় মেজর জেনারেল উবানের এই বাহিনীর গঠন, উদ্দেশ্য কর্মসূচীর ওপর সংক্ষিপ্ত বিবরণী তুলে ধরছেন ফ্যান্টমস অব চিটাগাংঃ দ্য ফিফথ আর্মি ইন বাংলাদেশ গ্রন্থে। এই বাহিনী প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেবিনেট সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারী মিঃ আর এন কাউ (যিনি একই সাথে 'র'-এর পরিচালক) ছিলেন আমার বেসামরিক উর্ধ্বতন কর্তা। আওয়ামী লীগ যুব শাখার এই সংগঠনটি এবং এর নেতৃত্ব সম্পর্কে খুঁটিনাটি খোঁজ-খবর করার সুবিধা ছিল তার। একই সাথে তার এই বিশ্বাস জন্মে যে, এই কারণে তিনি যুবনেতাদের আমার হাতে তুলে দিয়েছেন যে, একমাত্র তারাই ভাল কিছু দিতে পারেন এবং এ-ও মনে করেন যে,

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সবচেয়ে স্পর্শকাতর রাজনৈতিক এলাকায় কাজ করার সুযোগদানের জন্য তাদেরকে বিশেষ ধরনের মর্যাদা দেয়া দরকার।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার জন্য নয়; বরং মুক্তিযুদ্ধের সুবাদে বাংলাদেশের স্পর্শকাতার এলাকা এবং দিকগুলো সম্পর্কে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' যে দীর্ঘদিন থেকে বিশেষ নজর রাখছে সেই সত্য তুলে ধরার জন্যই এ আলোচনার সূত্রপাত। কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সমর্থনদান সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকলেও এই সমর্থন নিঃস্বার্থ ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এবং যুদ্ধ পরবর্তী ভারতীয় কর্মকান্ড এই প্রশ্নকে সবসময়ই বড় করে তুলে ধরেছে যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সত্যিই কি বন্ধু ছিল নাকি বন্ধুর ছদ্মাবরণে অন্য কোন কৌশল তারা গ্রহণ করেছিল ? এই প্রশ্নের সমাধান রাজনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ না করে পাবার কোন উপায় নেই। বর্তমান বাংলাদেশ যে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান এই সত্য স্বীকার-অস্বীকারের মধ্য দিয়েই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অর্থাৎ '৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানরাই পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল এবং সে কারণেই পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভারতীয় দৈনিকগুলো এবং সেখানকার গোয়েন্দা সংস্থা পূর্ব পাকিস্তানের দিকে বিশেষ নজর রেখেছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতীয় বাংলা দৈনিকসমূহ বার বার এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছে যে, '৪৭ থেকেই আমরা খেয়াল রাখছিলাম পূর্বের দিকে। সুতরাং এই খেয়াল রাখার মধ্যদিয়েই আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে গোয়েন্দাদের প্রতিনিধি ও কর্মী সচল রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীয় বক্তব্য ও বিবৃতি থেকেও এই সত্য প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্সে জেনারেল ওসমানীর উপস্থিত না থাকার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। বলে রাখা ভাল মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি তারা কার্যকর করতে সবটা সফল হয়নি বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে। বিশেষ করে এ অঞ্চলের মানুষের অন্তরে যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বন্ধন লালিত হয়েছে তার কারণেই 'র'-এর পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ থেকে যে নতুন চেতনাবোধের জন্ম হয়েছিল সেই স্বাতন্ত্র্য ধারাই ভারতের সাথে আমাদের আলাদা অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। '৭১-এর সংবিধানে যা-ই লিখা থাকুক না কেন এই দেশের মানুষ যে ধর্মাশ্রয়ী এবং ধর্মবিশ্বাসী এই সত্য প্রতিবেশী ভারতের গোয়েন্দারা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে অনুভব করেছিল। '৭৪ সালের

www.pathagar.com

দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষিতে গঠিত একদল বাকশাল ব্যর্থ হয়ে যাবার পর ভারতীয়রা বাংলাদেশের জনমানসে নৈরাজ্য সৃষ্টির নানা কৌশল গ্রহণ করেছিল। সম্ভাব্য সকল পথের সন্ধান তারা করছিল। '৭৫ সালে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের ওপর ভারতের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব কিছুটা হলেও শিথিল হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে বিবেচনায় রেখে ভারতীয়রা তাদের আন্তর্জাতিক মোড়লদের সহায়তায় নতুন কৌশল গ্রহণ করে। এই কৌশলের নাম ধর্মবিরোধী এনজিও। বলে রাখা ভাল বাংলাদেশে এনজিওগুলোর জন্ম হয়েছিল এক বিশেষ রাজনৈতিক শূন্যতার মধ্যে। প্রথম দিকে সরকারী আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং নানা সংস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এসব এনজিও বাংলাদেশের গেড়ে বসে। সে সময়ের বাস্তবতায় এমনও মনে করা হয়েছিল যে, দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে দেশের সরকারের ব্যর্থতার পাশাপাশি যদি বেসরকারী সফলতা অর্জিত হয়, তাহলে ক্ষতি কি ? এ ছিল সাধারণ মানুষের মত। কিন্তু দেশ পরিচালনায় সব কিছু জেনেও মুখে টেপ লাগিয়ে ছিলেন। তাদের এই চেপে যাওয়ার পেছনে ছিল 'র'-এর গভীর ষড়যন্ত্র। কারণ 'র' বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে নতুন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি; বরং পুরনো সিদ্ধান্তই একে একে কার্যকর করছে। উদাহরণ হিসেবে ফারাক্কা বাঁধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ফারাক্কা বাঁধ চালু করার প্রায় ২০ বছর আগ থেকে ভারতীয়রা এ বাঁধের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। বাস্তব অবস্থা এই যে, '৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার অনুমতি নিয়ে ভারতীয় পক্ষ এই বাঁধটি চালু করলেও পরবর্তীতে বাংলাদেশের কোন অনুমতি ছাড়াই তা বহাল রাখে। বাংলাদেশ তখন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশ। তখনও বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতীয় মিত্রতার গন্ধ ম্লান হয়ে যায়নি। অথচ ফারাক্কা বাঁধ চালু না করার জন্য বাংলাদেশের জনগণের আর্তনাদ-চিৎকার মিছিল আন্তর্জাতিক লবিং কিছুই তাদের কাজ লাগেনি, উপরোন্তু গঙ্গাসহ বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত অভিন্ন ৫৪টি নদ-নদীতে ভারতীয়রা বাঁধ দিয়েছে। এভাবেই বাংলাদেশ নিয়ে তাদের চক্রান্ত একটার পর একটা কার্যকর করে যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় চক্রান্তের কথা শুনলেই পাকিস্তানী গন্ধ খুঁজতে থাকেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা গেল গেল বলে চিৎকার করতে থাকেন। তাদের মনে রাখা দরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, কেই ইচ্ছা করলেই ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। আসলে তারা ভারতীয় আগ্রাসনের প্রসঙ্গে চেপে যেতে চান। 'র'-এর বর্তমান কর্মক্ষেত্রে যে বিশেষ বিশেষ এনজিও'র মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এসব এনজিও রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মানে বলে ঘোষণা করলেও আসলে তারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই ও কৌশল

www.pathagar.com

নির্ধারণেই ব্যস্ত রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না বিশেষ সংস্থার কর্তাব্যক্তিরাই তাদের পরিচালিত করছেন। ভারতীয় ঐ বিশেষ সংস্থার তদারকির সত্যতা প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইনকিলাবের প্রকাশিত একটি রিপোর্টে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, একটি প্রভাবশালী এনজিও'র উদ্যোগে দেশের মর্যাদা ও দায়িত্বপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত, পেশাজীবী শ্রেণী ও রাজনীতিকদের মধ্যে যারা নিয়মিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন কিংবা মসজিদ-মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা সংগঠন তৈরীতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকেন সেই সকল ব্যক্তিবর্গের উপর একটি সার্ভে ও সিক্রেট স্টাডি রিপোর্ট তৈরী করা হচ্ছে। গোপন ও রহস্যময় সার্ভে রিপোর্টের নামকরণ করা হয়েছে, স্টাডি রিপোর্ট ও এনিমিলিস্ট। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, সংবাদপত্র, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও পুলিশ-বিডিআর, আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে সকল নেতা-কর্মী সামাজিক পরিচিতি ও প্রভাব রয়েছে তাদের পুরো জীবন-বৃত্তান্ত, অতীত বংশ পরিচয়, অর্থবিত্তের উৎস, ধর্মের প্রতি দুর্বলতার কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

যে সংগঠন বা যারাই এ ধরনের স্টাডিতে নিয়োজিত রয়েছেন তারা যে শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনে এ কাজ করছেন না এ কথা না বললেও চলে। বলে রাখা ভাল, এনজিওটির লিস্ট তৈরী করার পর নিজেই দেখতে পাবে যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকই মসজিদ-মাদ্রাসা এবং ধর্মের সাথে যুক্ত। আমরা যদি বিশ্বব্যাপী এনজিও কর্মকান্ডের বিস্তৃত আলোচনা তুলে ধরি তাহলে দেখতে পাব মুসলিম এবং অমুসলিম দেশগুলোতে তাদের কাজ একই সমান্তরালে অবস্থান করে না। ধরা যাক, ইন্দোনেশিয়া, চিলি, পেরু বা এ ধরনের দেশগুলোর কথা। ইন্দোনেশিয়াতে এখনও অস্থিরতা চলছে। এক সময় এনজিওরা সেখানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশেও সর্বশেষ গ্রামীণ পর্যায়ের নির্বাচনে এনজিও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছে। অর্থাৎ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বৈধ হস্তক্ষেপের এখতিয়ার গ্রহণ করতে চাচ্ছে। বাংলাদেশের এনজিওগুলোর প্রধান কাজ যদি ইসলাম ধ্বংস করা হয় তাহলে বৃটিশ আমলেও এই ধরনের কাজে ছদ্মবেশী গুপ্তচরদের হদিস পাওয়া যাবে। মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করতে এক সময় কর্মরত বৃটিশ গুপ্তচর হেমপার তার জবানবন্দীতে স্বীকার করেছেন যে, বৃটিশ দখল বজায় রাখার জন্য তারা চুক্তিবদ্ধ বিভিন্ন দেশে কিছু কূটনীতিজ্ঞ নিয়োগ দিয়েছিলেন। যেখানে তারা রাজমিস্ত্রির ভূমিকা পালন করত। ঘুষ, অদক্ষ প্রশাসন, অসম্পূর্ণ শিক্ষা ইত্যাদি দুর্নীতি, সুন্দরী মহিলায় আসক্তি আর কর্তব্যে

www.pathagar.com

অবহেলার দিকে ধাবিতকরতঃ দেশের মেরুদন্ডকেই ভেঙ্গে দিত। হেমপাররা হয়তো এখন নেই, তবে তাদের উত্তরসুরিরা যে একই কাজ করছেন এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। রাষ্ট্রীয় গুপ্তচরদের সাথে নিলে এসব গুপ্তচররাই যে বাংলাদেশকে ধর্মহীন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেকথা এখন এনজিও প্রতিনিধিরাই প্রকারান্তরে স্বীকার করছেন।

গোপন তদন্ত যে এনজিওটি করছে সে আসলে একা নয়। দেখা যাবে তার সঙ্গী-সাথী আরো অনেক রয়েছে। বছর কয়েক আগে ব্র্যাকের একটি অঞ্চলে মসজিদ বন্ধ করার ঘটনা নিয়ে ব্র্যাক সদস্যদের মধ্যেই তুলকালাম কান্ড ঘটে গিয়েছিল। ব্র্যাক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও শিক্ষাদানের প্রধান কনসেপ্ট হচ্ছে ধর্মহীনতা। বাংলাদেশের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামবিরোধী শিক্ষা চালু করার জন্য ভারত থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত যেসব বই-পুস্তক বাজারে ছাড়া হয়েছে তা এখনও চালু রয়েছে। সেগুলো এনজিওদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কিনা তা ভেবে দেখা দরকার। মোট কথা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঊষালগ্ন থেকে বাংলাদেশকে ইসলামমুক্ত করে একে পঙ্গু ও ধ্বংস করার যে নীলনক্শা চালু করার চেষ্টা হয়েছিল তা বাস্তবায়নে এখন হয়তো 'র' এনজিওদের হাতে দায়িত্ব দিয়েছে। অর্থ এবং সুন্দরীদের কাজে লাগিয়ে দেশের মানুষের চেতনাবোধকে ভোঁতা করে দেয়ার এই চেষ্টা দারিদ্র্য বিমোচনের নামে শুরু করা হলেও এখন ধর্ম বিমোচন কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। যে কারণে দেশের সর্বোচ্চ আদালতেও ধর্মের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না। অন্যদিকে এনজিও কর্মকান্ড ধর্মবিরোধী হলেও 'র' বেতনভুক্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তা মানতে রাজি নয়। ভিন্ন প্রসঙ্গের একটি আলোচনা টেনে শেষ করতে চাই। ভারতপন্থী বলে পরিচিত একজন পেশাজীবী অন্য জনকে হাসতে হাসতে রাজাকার বলে গালি দিল। অন্য পক্ষ হাসতে হাসতে বলল, পাকিস্তান ছিল বলে তোদের মত অর্ধশিক্ষিত লোকদের বাজার খরচ ভারতীয় দূতাবাসের পয়সায় হতো। এখন তো যা দেয় তা দিয়ে পান-বিড়ির খরচই হয় না। যা শুরু করেছিল তা যদি চলতে থাকে তাহলে কিছুদিন পর ভারতীয় দাদাদের জুতা টানার কাজটাও পাবি না। আমাদের মনে হয় এনজিও'র বর্তমান ভূমিকা অব্যাহত থাকলে এ দেশের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা '৪৭ পূর্ব অবস্থার চেয়েও খারাপ হবে।

লেখক ঃ সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা।
সৌজন্য ঃ দৈনিক ইনকিলাব

www.pathagar.com

ফতোয়া ও ফতোয়াবাজীঃ এন.জি.ও. শয়তানীর একটি টার্গেটেড বিষয়

প্রফেসর (ড.) মোহাম্মদ আব্দুর রব

বাংলাদেশের ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী আওয়ামী সরকারের গত শাসনামলে পবিত্র ইসলাম ধর্মের অন্যতম পবিত্র একটি প্রতিষ্ঠান "ফতোয়া"কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২০০১ সালের ১ জানুয়ারী এক রায় ঘোষণা করেছিল। দেশের ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী, ইসলামবিদ্বেষী, ভারতপন্থী এবং পাশ্চাত্যমুখী সকল মহল এ রায়ে দারুণ উৎফুল্ল এবং হর্ষপুলকিত হয়ে বিবৃতি-বাখান রাখতে শুরু করেছে। কেউ কেউ হাইকোর্টের দু'জন আধুনিক পাশ্চাত্য আইনে প্রশিক্ষিত বিচারপতির রায়কে 'যুগান্তকারী' (আজকের কাগজ, ৩ জানুয়ারী), ঐতিহাসিক (A Historic Judgement : The Bangladesh Observer, 4 January, 2001) এবং কেউবা 'বিচার বিভাগের ইতিহাসে একটি মাইলফলক' (যুগান্তর, ৪ জানুয়ারী, ২০০১) বলে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেছেন। পত্রপত্রিকায় হাইকোর্টের বিচারকদ্বয়ের ঐ রায়কে মূলত "ফতোয়া জারিকে অবৈধ ঘোষণা" হিসেবেই উল্লেখ করে খবর ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। অবশ্য দেশের বৃহত্তর ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর প্রায় সকল মুসলমানই পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এহেন চরম ইসলামবিনাশী সংবাদে দারুণভাবে মর্মাহত, বিহ্বল ও বাকরুদ্ধ। তাঁরা কল্পনাই করতে পারছে না যে, দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রাণপ্রিয় জীবনাদর্শ পবিত্র ইসলাম ধর্মের একটি প্রধানতম প্রতিষ্ঠান ফতোয়াকে কেমন করে রাষ্ট্রের ও সংবিধানের সংরক্ষক উচ্চতর বিচার বিভাগ হাইকোর্ট "অবৈধ' বা 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করতে পারে। ফতোয়া ইসলামের পবিত্র ঐশী ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন ও রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র হাদীস শরীফের জ্ঞানের নিরিখে ইসলামী আইনে অত্যন্ত সুশিক্ষিত আলেম বা মুফ্‌তি (সনদপ্রাপ্ত)-দের কোরআন, হাদীস, ইজতেহাদ, কেয়াস ও ইজমার ভিত্তিতে দেয়া যে কোন ধর্মীয় কিংবা জাগতিক-ব্যবহারিক বিষয়ে দেয়া সুচিন্তিত ফায়সালা বা রায়। এ রায় বা ফতোয়া ইসলামের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান বা অঙ্গ। বিশ্বের দেড়শ কোটি মুসলমান ফতোয়া বিশ্বাস করাকে তাঁদের ঈমানের ও আদর্শের পবিত্র অংশ এবং আমানত হিসেবে মনে করে। ফতোয়াকে নিষিদ্ধ বা অবৈধ ঘোষণা করার মাধ্যমে মূলত পবিত্র কোরআন ও হাদীস তথা সম্পূর্ণ ইসলামকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণার এক প্রকাশ্য ধৃষ্টতাপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হবে;

www.pathagar.com

যেহেতু ইসলাম কোরআন ও হাদীসের সাথে সম্পর্কিত; আর শুদ্ধ ফতোয়াও কোরআন এবং হাদীসের নির্যাস বা ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

কোরআন ও ফতোয়াকে অবৈধ ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করার শয়তানী চক্রান্ত ও এহেন বেয়াদবীর ধৃষ্টতাপূর্ণ উদ্যোগ ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী ব্রাহ্মণ্যচক্র শাসিত ভারতে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে কয়েকবার গ্রহণ করা হলেও ভারতের সংখ্যালঘু নির্যাতিত-দলিত মুসলিম সমাজ বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে আর অকাতরে জেল-জুলুম ও শাহাদাতের বিনিময়ে তা রুখে দেয়। হিন্দুবাদী হিন্দুস্থানের উগ্র মৌলবাদী হিংস্র কংগ্রেস-বি.জে.পি চক্র ১৯৮৫ সালে অতিশয় অসহায় গরিব, অশিক্ষিতা তালাকপ্রাপ্তা শাহ্‌বানু নামক বৃদ্ধাকে তাঁর তালাকোত্তরকালের খরপোষ চালানোর জন্য তাঁর তালাকদাতা ভূতপূর্ব স্বামীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত্রমূলকভাবে মামলা দায়ের করায় এবং মামলার বিচারক (ভিন্-ধর্মাবলম্বী) তার দেয়া রায়ে ইসলামের ধর্মীয় বিধানের আইন (শরীয়া-আইন) -এর বিরুদ্ধে এক চরম ইসলাম বিরোধী ও ফতোয়া পরিপন্থী রায় প্রদান করে। ইসলামী আইন, শরীয়ত ও ফতোয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ-মূর্খ এক অমুসলিম বিচারকের ঐ চরম ধর্মবিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে ভারতের তৎকালীন ১০ কোটি মুসলমানের সকলেই শিয়া-সুন্নী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরিব সবাই তীব্র ক্রোধ আর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। লক্ষ লক্ষ তরুণ-যুবক-বৃদ্ধ-পুরুষ-মহিলা সকল তৌহিদপন্থী ভারতীয় মুসলমানই চরম ইসলাম-বিদ্বেষী ভারতীয় সরকার ও আত্মবিকৃত বিধর্মী বিচারকের ইসলামের মূলোৎপাটনের সূচনাকারী বিচার বিভাগীয় চরম পক্ষপাত ও ত্রুটিপূর্ণ রায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে রাজপথে নেমে শত শত মুসলমান তরুণ শাহাদৎ বরণ করে; তবুও তারা তাদের ধর্মের অঙ্গহানীমূলক ঐ শরীয়া বিরোধী ফতোয়া-বিধ্বংসী শয়তানী রায়কে প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত ঘরে ফেরেনি।

ঠিক একইভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাইকোর্টেও এক চরম ইসলাম-বিদ্বেষী ইসলামের মহান ধর্মগ্রন্থ মানবতার মুক্তিসনদ আল্লাহ্‌র বিধান বিশ্বের মুসলমানদের প্রাণের চেয়েও মূল্যবান পবিত্র আল-কোরআনকে অবৈধ এবং নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য অতীব শয়তানীপুর্ণ এক জঘন্য মামলা দায়ের করে। ধর্ম-বিদ্বেষী তথা ইসলামবিরোধী ভারতের নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিস্ট শাসিত পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা হাইকোর্টে ঐ মামলা বিচারের জন্য গৃহীত হলে আবারো সারা ভারতসহ মুসলিম বিশ্বের শত কোটি মুসলমান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে আর "আল্লাহু-আকবার" নাদে গর্জে ওঠে। শাহাদাতী-খুনের নজরানা আর জ্বিহাদী যুবাদের জঙ্গী জোশ খুব অল্প সময়েই ভীরু-ষড়যন্ত্রকারী ইসলাম বিরোধীদের হুঁশ ফিরিয়ে আনে; জনরোষে জ্বলেপুড়ে মরার আগেই তারা তড়িঘড়ি করে

www.pathagar.com

কলিকাতার হাইকোর্ট থেকে ঐ ইসলাম বিরোধী ও শরীয়া-ফতোয়া বিধ্বংসী "কোরআন অবৈধ-নিষিদ্ধ দাবি"র শয়তানী মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়। শুধু ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতেই নয়-দ্বীন ইসলামের প্রাণস্বরূপ পবিত্র কোরআন, দ্বীনি-শিক্ষা, হাদীস শরীফ, শরীয়া আইন ও ফতোয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র (চীন, রাশিয়া, সোভিয়েত ইত্যাদি), খ্রীষ্টবাদী দেশ ও ইহুদীরাষ্ট্র ইসরাইলে নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। শুধু তাই নয়, মুসলিম জনসংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অনেক রাষ্ট্র যেখানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিভূ খ্রীষ্ট-ইহুদী অক্ষচক্রের ক্রীড়নক ভোগবাদী মুসলিম নামধারী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী কিংবা নানা কিসিমের মুসলিম পরিচয়ের চরম ইসলামবিরোধী সরকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত, সেসব দেশেও হর-হামেশা ইসলাম, কোরআন-হাদীস, মসজিদ-মাদ্রাসা, শরীয়া এবং ফতোয়ার বিরুদ্ধে অজস্র ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলে। আর এ সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্যই ইসলাম ধর্মের মুলোৎপাটন এবং মুসলিম জাতির বিনাশ। আর এ সকল ইসলাম বিধ্বংসী কোরআন, হাদীস, শরীয়া, ফতোয়া, মাদ্রাসা ও আলেম-ওলামা বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র, আন্দোলন, চক্রান্ত ও অপতৎপরতার পেছনে সক্রিয় রয়েছে ইসলামের চরম শত্রু খ্রীষ্ট-ব্রাহ্মণ্য ও ইহুদীবাদীচক্রের প্রত্যক্ষ সাহায্য এবং তাদের অর্থ, কুপরামর্শ ও মদদপ্রাপ্ত এন.জি.ও. ((NGO) এবং মিশনারী নামধারী উচ্ছিষ্টভোগীদের হীন চাণক্য-চাল ও ঘৃণ্য কূটকৌশল। তাই তো আমরা দেখি, মুসলমানদের পবিত্র বাবরী মসজিদ ভারতীয় উগ্রধর্মান্ধ হিন্দুত্ববাদীদের শাবলাঘাতে প্রকাশ্য দিবালোকে চুরমার হলেও ঐসব মানবতার ধ্বজ্বাধারী এন.জি.ও. (NGO) -চক্র থাকে সম্পূর্ণ নির্বাক, চুপচাপ। আবার এসব অপতৎপরতাকামী আধিপত্য শক্তির বেতনভুক ও মদদপ্রাপ্ত এন.জি.ও. চক্রই বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্মের মূলোৎপাটন ও ধ্বংস সাধনের জন্য নানা সূক্ষ্ম ও হীন চক্রান্তজাল বিস্তারের মাধ্যমে এসব দেশের নতুন প্রজন্মের মধ্যে ইসলাম, ইসলামী শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠান (মসজিদ, মাদ্রাসা, তোয়া, শরীয়া ইত্যাদি) এবং ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও দলের বিরুদ্ধে চরম বিদ্বেষ, ঘৃণা ও অনীহা সৃষ্টির জন্য সদা তৎপর ও সক্রিয়।

ইসলামের জানি দুশমন খ্রীষ্ট-ইহুদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের লেলিয়ে দেয়া এজেন্ট 'নব্য ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীরূপী এন.জি.ও. (NGO) সমূহের নানা অপতৎপরতার মধ্যে প্রধানতম টার্গেট এদেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী মুসলমানদের (৯০%) চিন্তা-চেতনা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি আর জীবনাদর্শ থেকে গভীরভাবে প্রোথিত ধর্মীয় ভাবধারার মূলোৎপাটন। এন.জি.ও.-রূপী বিদেশী আগ্রাসী শক্তির এদেশীয় চোরেরা ভালমত জানে যে, এদেশে তাদের প্রভুদের স্বার্থের জাল বিস্তারের তথা

www.pathagar.com

আধিপত্য কায়েমের প্রধান অন্তরায় বা বাধা হচ্ছে ধর্মপ্রাণ মানুষের তীব্র ধর্মানুভূতি ও তাদের পবিত্র জীবনবিধান ইসলাম। ইসলামের বৈপ্লবিক শিক্ষা ও কালজয়ী বৈজ্ঞানিক-ব্যবহারিক আদর্শ এদেশের ১৩ কোটি মানুষকে সকল আগ্রাসন, শোষণ, ত্রাসন আর চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আর চরম দ্রোহে জ্বলে ওঠতে উজ্জীবিত করে। 'নব্য ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী' এন.জি.ও. চক্র ও তাদের মদদগার আগ্রাসীশক্তি ও আধিপত্যবাদীদের নানা গোয়েন্দা এজেন্সি (যেমন; সি.আই.এ., 'র', মোশাদ ইত্যাদি) এবং এসব সংস্থার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এদেশ ও বিদেশের নানা নামের মুখোশধারী গবেষণা সংস্থা তাদের গবেষণালব্ধ উপাত্ত ও ফলাফল থেকে বুঝতে পেরেছে, যে কোন মূল্যেই বাংলাদেশ ও অন্যান্য সম্ভাব্য ইসলামী পুনরুজ্জীবনকামী জাতি ও রাষ্ট্রসমূহের তরুণ-প্রজন্মের মন-মগজ থেকে ইসলাম ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল প্রক্রিয়া-প্রতিষ্ঠানকে সমূলে সূক্ষ্ম-দক্ষতায় সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে ফেলতে হবে। তরুণ ও নবীন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা ও বোধ-মননে ইসলাম, আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, মসজিদ-মাদ্রাসা, দাড়ি-টুপি, পর্দা-হেজাব, মুফতি-ফতোয়া, রোজা-নামাজ, হজ্ব-যাকাত এমনকি কোরআন-হাদীস ইত্যাদি সম্পর্কে ধীর-বিষক্রিয়ায় (Slow Poisoning) সুতীব্র অনীহা, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা আর সন্দেহের বীজ প্রবিষ্ট করাতে হবে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশ– যেখানে প্রায় ১২ কোটি মুসলমান তাদের পবিত্র ধর্ম ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে নিজেদের সংস্কৃতির প্রধান নিয়ামক ও উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে থাকে– যে দেশটি তার বিশেষ ভূ-রাজনৈতিক এবং ভূ-আর্থনীতিক অবস্থানের জন্য বর্তমান এক-কেন্দ্রিক বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রধান নিয়ন্ত্রক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের দুই প্রধান উঠতি ভবিষ্যৎ পরাশক্তি চীন ও ভারতের কাছে বিশেষভাবে গুরুত্ববহ এবং অপরিহার্য সেই দেশটির মাটিতে এসব পরাশক্তিসহ সকল আধিপত্যবাদী শক্তির স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রধান অন্তরায় এদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় ও আত্মসচেতনতার প্রধান মন্ত্র ইসলাম ও ইসলামী চেতনা। আর এদেশের ১২/১৩ কোটি আধিপত্যবাদ বিরোধী জনমানুষের ঐ সঞ্জীবনী চেতনা ইসলামের ধারক, বাহক, প্রসারক ও প্রচারক তথা রক্ষক হচ্ছে ঐ দেশের লক্ষ লক্ষ দ্বীনদার ওলামা-মাশায়েখ, মুফতি-মাওলানা, পীরবুজর্গ আর তাঁদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হাজার হাজার মসজিদ-মাদ্রাসা, খানকা-মক্তব আর অসংখ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা। ইসলামের এ সকল দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের মতো শরীয়া ও ফতোয়া একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান বা ইসলামের অঙ্গ।

www.pathagar.com

পৃথিবীর যেখানেই মুসলমানদের মধ্যে শরীয়া বর্তমান সেখানেই ইসলাম জিন্দা, কোরআন বাঙময় আর ফতোয়া জীবন্ত। আর ঐ শরীয়া বা ফতোয়া– যা কোরআন-হাদীসের নির্যাস তা বাতিল ও তাগুতি শক্তির তথা ইসলাম বিরোধী শয়তানীচক্রের জন্য এক চরম বিষবৎ বস্তু; তাদের জীবন-সংহারী মন্ত্র। এ ফতোয়ার রায় প্রকৃত, যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ এবং বাস্তবায়ন সকল ইসলাম বিরোধী খোদাদ্রোহী শয়তানী চক্রের কাছে তীব্র 'পটাসিয়াম-সায়ানাইড' স্বরূপ। এ ফতোয়ার যথার্থ প্রয়োগেই ১৮৩০-এর বালাকোটের জিহাদে শহীদ আহমদ বেরেলভীর কাছে উপনিবেশবাদী বেনিয়া বৃটিশদের নাভিশ্বাস তুলেছিল; তারপর ১৮৫৭-র উপমহাদেশের আজাদীর প্রথম বিদ্রোহে এরকম ফতোয়ার 'ফায়ার-পাওয়ার'ই মীরাট, মুরাদাবাদ, বারাকপুর, পাটনা, জালালাবাদ, ঢাকা আর লাখনৌ-এলাহাবাদে ঘুমন্ত মুসলমানদের মধ্যে জিহাদী-জজবায় জ্বালিয়ে দিয়েছিল এক প্রচন্ড স্বাধীনতাযুদ্ধের তীব্র দাবানল; এ ফতোয়ার তীব্র দাহন যুগে যুগে ঘুমন্ত মুসলমানদের ঈমানী-তেজ আর জিহাদী-জজবাকে করেছে উজ্জীবিত ও প্রজ্জ্বলিত। এ ফতোয়ার তাজাল্লী আর ঔজ্জ্বল্যে যুগে যুগে মুরতাদরূপ শয়তান রুশদী, দাউদ হায়দার আর যৌন-বিকার-গ্রস্থ ভ্রষ্টা দেশ ও জাতিদ্রোহী তসলিমাদের হীন চক্রান্তকে নস্যাৎ ও বানচাল করে দিয়েছে ও ভবিষ্যতে দিয়ে যাবে। তাই ইসলামের দুশমন বাতিল ও তাগুতিশক্তির এদেশীয় প্রতিভূ নাস্তিক, মুরতাদ ও অপতৎপরতাবাদী এন.জি.ও. এবং মিশনারীচক্র সদা-সর্বদাই মাদ্রাসা শিক্ষা, ওলামা-মাশায়েখ ও ফতোয়াকে নতুন প্রজন্মের কাছে ধিকৃত, বিকৃত ও খারাপভাবে চিত্রিত করার প্রয়াসে এদেশে তথাকথিত "ফতোয়াবাজী' শব্দের প্রচলন ও ফতোয়ার বিরুদ্ধে নিরন্তর অপপ্রচার চালিয়ে গেছে এবং এখনো চালিয়ে যাচ্ছে।

বিচারপতি রাব্বানী ও তাঁর সঙ্গী মহিলা বিচারপতির দেয়া ফতোয়া নিষিদ্ধ ঘোষণার রায়ে বাংলাদেশের সাধারণ জনমানুষের মধ্যে যদিও বিশেষ কোন উৎফুল্লতা দেখা দেয়নি- তবুও এ রায়ের বিষয়ে ক্রমে অবহিত হবার ফলে দেশের রাজধানীসহ নানা জনপদে ধীরে ধীরে প্রতিবাদের সুর তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। হাইকোর্টের বিচারপতি রাব্বানী ও তাঁর সঙ্গীর এ রায়ের পক্ষে যে ক'টি চিহ্নিত মহল বিশেষ হর্ষ ও উৎফুল্ল দেখাচ্ছে তারা সব সময়ই দেশের জনগণের মধ্যে ইসলামবিদ্বেষী, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং ইসলামের কৃষ্টি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিপক্ষের বলে পরিগণিত ও চিহ্নিত। এককালের আওয়ামী নেতা ড. কামাল হোসেন, ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম ও তাঁর কন্যা তানিয়া ইসলাম সব সময়ই ধর্মনিরপেক্ষ ঘরানার কিংবা আওয়ামী বলয়ের আইনজীবী বলে খ্যাত। এদের

www.pathagar.com

কেউ বাংলাদেশের গণধিকৃত, ধর্মদ্রোহী ও বিতাড়িতা তসলিমা নাসরিনকে আশ্রয় ও আইনী মদদ দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

আরোও অবাক ও বিস্মিত হবার কথা, মুসলিম ধর্মাবলম্বী না হয়েও ইসলামের পবিত্র বিধানের অঙ্গ ফতোয়া নিষিদ্ধ করার বিষয়ে আনন্দ ও উৎফুল্ল প্রকাশ করে যারা বিবৃতি দিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক গঞ্জিকাসেবী বলে কুখ্যাত ধর্ষকামী কবি শ্রীমান নির্মলেন্দুগুণ (ঢাকা), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী সনৎকুমার সাহা, অধ্যাপক সুব্রত মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ অধিকারী, ড. বিধানচন্দ্র দাস এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের শ্রীমতি হেনা দাস ও বিরূপাক্ষ পাল প্রমুখ। দেশের বরেণ্য আলেম মাওলানা মুফতি ফজলুল হক আমিনীর বিরুদ্ধে যারা মামলা করেছেন তাদের মধ্যে একজন অমুসলিম আইনজীবী কক্সবাজারের শ্রী রাখাল চন্দ্র মিত্রের নাম দেখতে পাই। শুধু তাই নয়, সমাজবাদী ওয়াকার্স পার্টির প্রবীণ নেতা শ্রীযুক্ত বিমল বিশ্বাসের মতো প্রাজ্ঞজনও ফতোয়ার এ রায়ের পক্ষে তাঁর অভিনন্দন জানতে বিলম্ব করেননি। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অন্যতম খুঁটি ফতোয়ার বিরুদ্ধে শিল্পী কার্টুনিষ্ট শ্রীমান শিশির ভট্টাচার্য অত্যন্ত অশালীন ও বেয়াদবীপূর্ণ কার্টুন প্রকাশ করেছেন তড়িঘড়ি দৈনিক প্রথম আলোর প্রথম পাতায় (৪ জানুয়ারী, ২০০১)। কার্টুনটিতে শ্রী ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, 'একজন দাড়িধারী ইসলামী লেবাস পরিহিত আলেমের ('ফতোয়াবাজ' নাম কপালে লিখে) দু'ঠোট নিষ্ঠুরভাবে অশালীন হাসিতে ফেটে পড়ে, এমতাবস্থায় একজন বেশ্যার মতো নারী সুঁই-সুতা দিয়ে তার দু'ঠোট মহানন্দে সেলাই করে দিচ্ছে। পেছনে বিমর্ষভাবে অন্য একজন দাড়ি-টুপিধারী আলেম (মুসলিম সমাজের প্রতীক) দাঁড়িয়ে তা ভয়ে ভয়ে দেখছেন। আসলে শ্রীমান ভট্টাচার্য বাবু তার তুলিতে শুধু আলেম সমাজের ঠোঁটই সেলাই করছেন না- বরং তা বিমূর্তভাবে ইসলামী সমাজেরই আগামী দিনের অবস্থা যা কার্টুনিস্ট শিশিরের স্বগোত্রীয়দের পরমকাম্য- তা অত্যন্ত দৃঢ় আস্থায় পরম আত্মতৃপ্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শুধু কবি নির্মলেন্দু, এডভোকেট মিত্রবাবু কিংবা কার্টুনিষ্ট ভট্টাচার্যই যে ৯০% ভাগ মুসলমানদের দেশে ইসলামের এহেন দুরবস্থায় আনন্দ বিবৃতি দিয়ে রায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন তা নয়, এন.জি.ও. (NGO) "আইন ও সালিস কেন্দ্র"-এর নেত্রী ড. ফস্টিনা পেরেরার মতো একজন খ্রীষ্টান নেত্রীও দ্রুত বক্তব্য রাখেন এ বিষয়ে। তার মতে, ফতোয়ার বিরুদ্ধে (নিষিদ্ধ ঘোষণার) দেয়া রায় "ধর্মের নামে মৌলবাদীদের অপতৎপরতা রুখতে সাহায্য করবে" (প্রথম আলো, ৪

www.pathagar.com

জানুয়ারী ২০০১)। একজন শিক্ষিতা খ্রীষ্টান হয়ে কিভাবে তিনি এমন বিবৃতি দিতে পারেন ভেবে অবাক হতে হয়।

সাবেক কম্যুনিস্ট পার্টি সমর্থক ও বর্তমানের প্রথম কাতারের ইসলাম-বিদ্বেষী দৈনিক সংবাদেও এ বিষয়ে একটি অত্যন্ত আপত্তিকর কার্টুন ছাপা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে একজন দাড়ি-টুপিধারী আলেমকে গাছের সাথে বেঁধে শিশু, নারী ও পুরুষরা জুতা ঢিল ছুড়ছে ও অপমান করছে। যে কোন বিবেকবান ধার্মিক কিংবা মানবতা বোধ সম্পন্ন মানুষই এতে আহত না হয়ে পারে না। ৭ জানুয়ারী, ২০০১-এর পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়, শুধু বাংলাদেশের ইসলাম-বিদ্বেষী গোষ্ঠী ও এন.জি.ও.'রাই নয় বরং 'ফতোয়া' বিষয়ে হাইকোর্টের এ রায়ে বিদেশের ইসলাম ও মুসলিম-বিদ্বেষী সংস্থা-সম্প্রদায় তাদের আনন্দের ও স্বস্তির অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বিবৃতি-মন্তব্য দেয়া শুরু করেছে। লন্ডনভিত্তিক তথাকথিত মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' বাংলাদেশের হাইকোর্টে সব ধরনের ফতোয়া নিষিদ্ধ ঘোষণাকে একটি "মাইকফলক" হিসেবে অভিহিত করেছে (The Daily Star, 7-1-2001)। 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' নামধারী খ্রীষ্টান ও ইহুদীচক্রের অর্থপুষ্ট এ সংস্থা কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়াসহ সব স্থানের মুসলমান নারী, শিশু, বৃদ্ধদের হত্যা কিংবা ইরাক, সোমালিয়া, সুদানে যুক্তরাষ্ট্র-জাতিসংঘের অন্যায় নিষেধাজ্ঞার ফলে হাজার হাজার শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলার গণহত্যায় টু' শব্দও করে না। কিন্তু বাংলাদেশে এন.জি.ও.'দের সাজানো নাটক কিংবা বানোয়াট সংবাদভিত্তিক তথাকথিত ফতোয়াবাজীর নিরিখে দায়ের করা মামলার রায়ে ফতোয়া অবৈধ ঘোষণাকে একটি মানবতার বিজয় বলে অভিহিত করতে মোটেই কাল বিলম্ব করল না তারা। ফতোয়া নিষিদ্ধ করার হাইকোর্টের এ রায়ে আরও খুশি হয়ে রায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন এদেশে কাদিয়ানীদের দোসর বলে কুখ্যাত আওয়ামী ওলামা নেতা ইসলামী ফাউন্ডেশনের সাবেক ডি.জি. ধর্মনিরপেক্ষ মাওলানা আবদুল আউয়াল। তাছাড়া, স্বঘোষিত ডক্টরেট ডিগ্রীধারী প্রশিকা এনজিও-র প্রধান কাজী ফারুক, উগ্র নারীবাদী শ্রীমতি এরোমাদত্ত, এডাবের চেয়ারপারসন এন.জি.ও. নেত্রী খুশি কবীর প্রমুখ এ রায়ে দারুণ উৎফুল্ল। এসব এন.জি.ও. নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ দৌলতদিয়ার পতিতালয় সহ দেশের নানাস্থানে বেশ্যাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে বেশ্যা-সম্মেলনের (যৌনকর্মী সভা নামে) আয়োজন করে থাকেন এবং আন্দোলন করে থাকেন।

www.pathagar.com

ফতোয়া নিষিদ্ধকরণের পক্ষে অর্থাৎ সব ধরনের ফতোয়ার বিরুদ্ধে দেয়া এই বিতর্কিত রায়ের অন্যতম বিচারক গোলাম রাব্বানীকে দৈনিক মানবজমিন, ৭ জানুয়ারী ২০০১ প্রধান খবর বা লীড-নিউজে একজন অত্যন্ত বিতর্কিত ও ঐ একই ধরনের অন্য একটি মামলার দেয়া রায়ের জন্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ভর্ৎসিত ও তিরস্কৃত হয়েছেন বলে উল্লেখ করে এর বিশদ সংবাদ প্রকাশ করেছে (১৯৯৫ সনের ৯ জানুয়ারীর একটি সুয়োমোটো মামলায়)। বিচারপতি রাব্বানী বিচারাধীন (Sub-Judice) মামলার রায়কে প্রভাবিত করার মতো নিজ প্রবন্ধ, নিজে একজন বিচারপতি হওয়ার পরও (ডেইলী স্টার, ৫ নভেম্বর ১৯৯৮) এ ছেপে সিনিয়র বিচারপতিদের তীব্র ভর্ৎসনার ও সতর্কীকরণের কারণে পরিণত হন (প্রবন্ধের নামঃ "মুসলিম ল' মেইনট্যান্যান্স অব এ ডিভোর্সড উইম্যান")। রাব্বানির এহেন দৃষ্টিকটু, অন্য একটি কাজ মাত্র গত ৬ জানুয়ারী ২০০১-এ তাঁর ইসলাম সম্পর্কিত লেখা বই এর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী আলোচকদের নামের তালিকা দেখেও তাঁর দেয়া ফতোয়ার বিতর্কিত রায়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। রাব্বানির লেখা ("Journey Within Islam" গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে B.I.L.I.A নামক NGO -আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঐ বিতর্কিত বিচারপতি রাব্বানিসহ ঐ একই বিতর্কিত সুয়োমোটো মামলার অংশগ্রহণকারী আওয়ামী পন্থী আইনজীবী বলে খ্যাত ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম, তদীয় কন্যা তানিয়া আমীর, এডভোকেট সৈয়দ আহ্‌মদ প্রমুখ অংশগ্রহণ করে মামলাটির ফতোয়াবিরোধী রায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সংশিষ্ট সুয়োমোটো মামলার তখনো আপীলের জন্য অপেক্ষাধীন বিচারের রায়ে সংশিষ্ট বিচারপতির উপস্থিতিতে বিজ্ঞ (?) আইনজীবীরা কিভাবে দেশের আলেম ওলামাদের ও ফতোয়ার-বিরুদ্ধ বক্তব্য রাখতে পারেন তা ভাবলে আবারো অবাক হতে হয়– তবে এতে সকল ঘটনাপ্রবাহের সুস্পষ্ট যোগসূত্র পাওয়া যায়।

মূলকথাঃ ফতোয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আসলে বাংলাদেশে ইসলাম ও ইসলামী কৃষ্টি-সংস্কৃতির ওপর নিষেধাজ্ঞা চালু করার বা উদ্যোগ গ্রহণের একটি প্রথম ধাপ বা 'টেস্ট কেস'। এ জন্যেই ইসলামের পরম দুশমন অপতৎপরতাকামী এন.জি.ও. মহল ও অমুসলিমরা এ রায়ে এত বেশি আনন্দিত ও উৎফুল্ল ॥

লেখক ঃ অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

সারসংক্ষেপ

"বাংলাদেশের এনজিও তৎপরতা বনাম অপতৎপরতা" — এদেশের না সাহায্য সংস্থা তথা এনজিওদের উপর দেশের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীবীদের লেখা একটি প্রবন্ধ সংকলন। এ দেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বিগত প্রায় তিনটি দশক ধরে দেশের ভাগ্যাহত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের জন্য এসব এনজিও নামধারী সাহায্য সংস্থাগুলো কাজ করে আসলেও এসবের অনেকগুলোই ক্রমে জনগণের চোখে "নব্য ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী" বা শোষক বেনিয়া "নব্য কাবলিওয়ালা" হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েছে। গরীব হতভাগ্য জনগণের অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসা ও ভাগ্যোন্নয়নের নাম করে দেশ-বিদেশের নানা দাতা সংস্থা থেকে শত শত কোটি টাকা নিয়ে এসে এসব এনজিও চক্র এর বেশীর ভাগই তাদের ধুরন্ধর ভোগবাদী কর্মকর্তাদের ভোগের প্রসাদ হিসেবে তুলে দিচ্ছে। এদের বিলাসী, লোভী কর্তা-নেতৃবৃন্দ দেশে "গরিবী হঠাও" জিগির তুলে নিজেরা "পাজেরো কালচার"-এর আয়েসী জিন্দেগীতে গা-ভাসিয়ে দিয়েছে। সীমাহীন লুটপাট, বিলাস-ব্যাসন, অবাধ যৌনাচার গরীবদের উপর নানা নিপীড়ণ-নির্যাতনের অসংখ্য তথ্য বেরিয়ে পড়ছে এসব ছদ্মবেশী এনজিও-দের প্রাসাদোপম হেড-কোয়ার্টারগুলোর তাপানুকুল দেয়ালের ফাক-ফোঁকর গলে। এসব অনাচার ও লুণ্ঠণ প্রক্রিয়ার কিছু কিছু চিত্র ধরা পড়েছে সংকলিত এ' পুস্তিকায় উপস্থাপিত দেশের খ্যাতিনাম বুদ্ধিজীবীদের লেখা নিবন্ধ সমূহে বিধৃত তথ্য-উপাত্তে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com